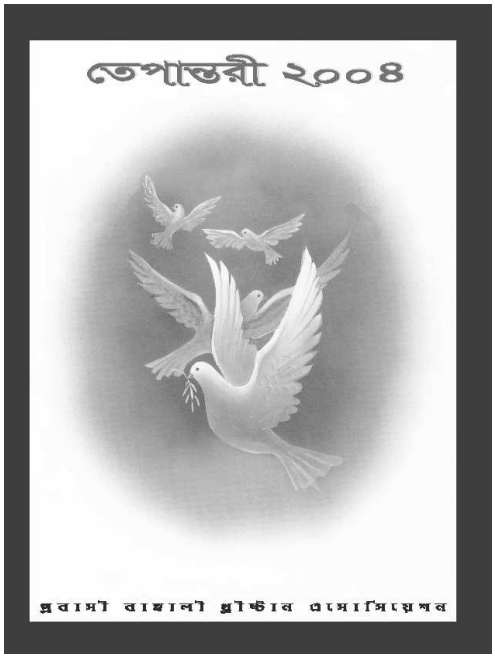

তেপান্তরী ২০০৪

পঞ্চদশ সংকলন / বড়দিন সংখ্যা

সম্পাদক মন্ডলীঃ

সাইমন গমেজ
যোসেফ ডি' কস্তা
লুইস সুবীর রোজারিও

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

অনিল রোজারিও
শীলা রোজারিও
রবার্ট সুজয় রিবেরু
আগাথা রোজারিও
বেঞ্জামিন রোজারিও
ফ্রাঙ্কো গমেজ
ডোমিঙ্গো অনিল গমেজ
নরবার্ট মেন্ডেজ
আগস্টিন জীবন গমেজ
জন বাড়ৈ
চেস্টার গমেজ
ডেরিক গনছালভেস

প্রকাশনায় ঃ

প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীস্টান এসোসিয়েশন
পি.ও. বক্স - ১২৫৮
নিউইয়র্ক, এন ওয়াই -১০১৫৯-১২৫৮
ওয়েবসাইটঃ www.PBCAusa.org
ফোনঃ (917) 767-4632, (718) 441-4883

কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ঃ
রাশেদ আনোয়ার (৯১৭) ৬০৭-৬৮৩৩

সম্পাদকীয়

পৌষের হিমেল হাওয়ার নিঝুম রাত মনে করিয়ে দেয় খ্রীষ্টের জন্মের কথা। এই পাপময় পৃথিবীতে তাঁর আগমনের আনন্দ–অনুভূতিতে মানব হৃদয় হবে সিক্ত ও সতেজ। রাজাধিরাজ জন্ম নিবেন অতি দীনবেশে বেথলেহেমের এক গোশালায়।

খ্রীষ্টের জন্ম একটি 'আমন্ত্রন' বিশেষ। এই আমন্ত্রন আসে স্বয়ং শিশু যীশুর কাছ থেকে। পবিত্র পরিবার যোসেফ–মেরীর কাছ থেকে। স্বর্গ দূতেরা সর্ব প্রথম এই আমন্ত্রন বয়ে নিয়ে আসে মরুভূমিতে রাত জেগে পাহারারত ডানপিটে একদল রাখালদের কাছে। এই আমন্ত্রন হোল, মানবজাতির পাপের দাসত্ব থেকে ঐতিহাসিক মুক্তির স্বর্গে প্রবেশের পুনঃঅধিকার, খ্রীষ্টের সন্তান হওয়ার পুনঃঅধিকার, পৃথিবীতে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি।

কিন্তু বর্তমান জগত খ্রীষ্টের এ আমন্ত্রনের তাৎপর্য বুঝেনি। তাই পৃথিবীতে চলছে অবিরাম অশান্তি। যুদ্ধ, হত্যা, ধ্বংস ও প্রতিশোধ। খ্রীষ্টের আমন্ত্রন এখানে অবহেলিত লাঞ্ছিত ও ধুলোয় লুণ্ঠিত। খ্রীষ্ট আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে, আমরা কি তাকে গ্রহন করতে প্রস্তুত? তিনি আমাদের সকলকে ডাকছেন। আসুন, আমরা তার দিকে মন ফিরাই। হৃদয় থেকে হিংসা, দ্বেষ দূর করি। প্রতিবেশীকে ভালবাসি। ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলে খ্রীষ্টকে হৃদয়ে আহ্বান করি। তাঁকে হৃদয়ে বরন করি ও ধারন করি। তবেই সে বড়দিন হবে সুখময় ও আনন্দময়।

পরিশেষে 'তেপান্তরী'র পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই শুভবড়দিন ও নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

– সম্পাদক মন্ডলী

CHRISTIAN ORGANIZATIONS IN NORTH AMERICA:

UNITED STATES OF AMERICA:

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, INC.
P.O. Box-1258 Madison Square Station, New York, NY 10159-1258 USA
Phone: 917-767-4632 718-805-4941 718-441-4883
Web: www.pbcausa.org
President: Joseph D' Costa General Secretary: Richard Biswas
Registered non-profit organization 501(c)(3).

SOURCE AND SOLUTIONS INC. (COOPERATIVE SOCIETY)
P.O. Box- 3691 Grand Central Station, New York, NY 10163-3691 USA
Phone: 609-936-1194 718-429-3971
President: Mr. Norbert Mendes General Secretary: Mr. Paul B. Bala

BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION
743 Northampton Drive, Silver Spring, MD 20903 USA
Phone : 301-439-7541 Email: imukti@yahoo.com
President: Mr. Simon Pereira General Secretary: Mr. Bablu Rozario

CHRISTIAN JUBO SHAMAJ
1350 Windmill Lane, Silver Spring, MD 20905, USA
Phone: 301-384-4921 301-431-1942 Email: ustadzee@yahoo.com
Contact: Mr. Collins Gomes Mr. Samual D'Costa

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE SOCIETY
808 Cannon Road, Silver Spring, MD 20904
Phone: 301-879-3108 301-431-3133
President : Mr. Subash C. Rozario General Secretary : Mr. Felix Gomez

---

CANADA:

BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF ONTARIO, CANADA
31 Beacon Hill Road, Etobicoke, ON M9V 2K8 CANADA
Phone: 416-745-4650 416-269-1656
President : Mr. Pascal Gomes General Secretary: Mr. James Gomes (Uzzal)

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE OF ONTARIO, INC.
155 Linden Avenue, Toronto, ON M1K 3J1, CANADA
Phone: 416-267-5221 416-691-3153 Email: bccso2000@hotmail.com
President: Dr. David H. Mazumdar Gen. Secretary: Mr. Gabriel S. Rozano

BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF CANADA, MONTREAL
805 Boul. Ste. Croix
St. Laurent, Montreal, Quebec, QC H4L 3X6 CANADA
Phone: 514-748-2762
Acting President: Mr. Sunil Gomes General Secretary: Mr. William Gomes

---

BERMUDA:

BENGALI CULTURAL ORGANIZATION, BERMUDA
35 Happy Valley Road
Pambrook HM 12 Hamilton, BERMUDA
Phone : 441-296-8336 441-296-6587
President: Mr. Robin Deesa General Secretary: Mr. Patrick Gomes

PBCA EXECUTIVE BOARD MEMBERS:

PRESIDENT	: JOSEPH D' COSTA
VICE-PRESIDENT	: PROVA GONSALVES
GENERAL SECRETARY	: RICHARD BISWAS
JOINT SECRETARY	: WILLIAM GOMES
TREASURER	: XAVIER GOMES
ASST. TREASURER	: DANIEL GOMES
JOINT CULTURAL SECRETARY	: LITON GREGORY
JOINT CULTURAL SECRETARY	: PROBIR DESA
ORGANIZING SECRETARY	: SIRUS ROZARIO
JOINT YOUTH & SPORTS SEC.	: JOHN MALO
JOINT YOUTH & SPORTS SEC.	: SAMUEL QUIAH
EXECUTIVE MEMBER	: SYLVIA D'COSTA
EXECUTIVE MEMBER	: PHILIP GOMES

BOARD OF ADVISORS:

ANIL ROZARIO
ANTHONY BIMAL GOMES
ANTHONY GOMES
ARUP MARK MODHU
BENJAMIN ROZARIO
CLEMMENT BADAL ROZARIO
DOMINGO ANIL GOMES
FR. STANLEY GOMES
GABRIEL D'CRUZE
IRENE ROZARIO
JOHN BAROI
JOSEPH PRODIP DAS
JULIOUS HALDAR
LOUIS SUBIR ROZARIO
MABLE GOMES
MOSES PATWARY
NIPU GANGULY
NIRMAL GOMES
NORBERT MENDES
PAUL BALA
PATRICK ROZARIO
RAYMOND GOMES
ROBERT GOMES
SAMIR DATTA
SEBASTIAN ROZARIO
SHEILA ROZARIO
SIMON GOMES

ADDRESS : PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, INC.
P.O. Box - 1258 Madison Square Station
New York, NY 10159-1258
PHONE : 917-767-4632 718-805-4941 718-441-4883

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ১
খ্রীষ্টান অর্গানাইজেশন্‌স ইন নর্থ আমেরিকা ২
সভাপতির বাণী ৪
সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর থেকে..... ৫
বাণী - ফাদার ষ্ট্যানলী ৬
বাণী - নরবার্ট জি. ম্যান্ডেজ..... ৭

প্রবন্ধঃ

এক নীরব রাতে বেথলেহেমে ৮
খ্রীষ্টান গৃহ খ্রীষ্টেরই গৃহ..... ১০
Epiphany..... ১১
এই বিদগ্ধ ধরণীর আমি এক সাধারণ মানুষ..... ১২
The Changing Face of the PBCA Cabinet ১৩
অথচ পবিত্র ১৪
Bangladesh Then And Bangladesh Now ১৬
In loving memory of my father, Raphael Gomes.. ১৮
তিন বন্ধুর গল্প এবং আমাদের ভূমিকা..... ১৯
The Truth About Ms. Virginia ২১
বহমান জীবনের সুখ দুঃখ ২৩
স্পাই ২৬
আমার এক ছোটিসি স্টোরি ২৭
বাবুর্চি ২৮
বঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের আগমন ৩০

উত্তর আমেরিকার খবরাখবরঃ

বারমুদা ও নর্থ ক্যারোলিনা..... ৩২

কবিতাঃ

বড়দিন ৩৪
দাদু - দিদিমা ৩৪
যে খ্রীষ্ট ভক্তরা বড়দিন ঘৃণা করে ৩৫
সত্যিকারের মানুষ ৩৬
বৃদ্ধ..... ৩৬
মা ৩৭
Thoughts ৩৭
Only You ৩৮
The Christmas Star..... ৩৯
An Elephant..... ৩৯
জেনে রাখা ভাল..... ৩৯
শুভ পরিণয় ৪০
যাদেরকে পেলাম..... ৪০
An Appeal To Save A Life ৪১

সভাপতির বাণী

'ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে
জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ
যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়।'

হাজার বছর আগে যে শিশুটি গোয়াল ঘরে ভুমিষ্ঠ হয়েছিল আমাদের পাপ হ'তে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আজ তাঁর এ শুভ জন্মতিথিতে প্রবাসীর সকল সদস্য ও সদস্যাকে জানাই ভালবাসা ও শুভেচ্ছা। জগতের এ প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাঝে প্রভু যীশুর আদর্শ প্রতিবেশীকে আপনার তুল্য প্রেম করা থেকে যেন আমরা দূরে সরে না যাই। যেন আমরা সকল দুঃখ, কষ্ট, গ-ানিকে সরিয়ে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নতুন জীবন লাভ করতে পারি।

আমাদের এ সংগঠন প্রবাসীর সকল কাজে যারা আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তার জন্য সকলকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খ্রীষ্টের জন্মতিথি ও নববর্ষ সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি, প্রাচুর্য ও আশীর্বাদ।

ধন্যবাদ

যোসেফ ডি'কস্তা

সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর থেকে

ঈশ্বর তাঁর ত্রাণকর্তাকে এ জগতে পাঠিয়েছিলেন যেন সমস্ত মানবজাতি তাদের পাপ থেকে মুক্তি পায়। যার ফলশ্রুতিতে ঈশ্বরের পুত্র স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট এ ধরায় আগমন করেন এক অতি জীর্ণ গোশালায় - আনন্দ, প্রেম ও শান্তির বাণী নিয়ে।

বিগত ২৫শে এপ্রিল, ২০০৪, প্রবাসীর বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মত এবারও আমরা আমাদের ধারাবাহিক কার্যক্রম অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছি। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবেই আমরা এই বছরে খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ, শ্রদ্ধেয় বিশপ ও ফাদারদের অভ্যর্থনা, বার্ষিক বনভোজন, বার্ষিক বড়দিন পূণর্মিলনী অনুষ্ঠান, তেপান্তরী সংখ্যা এবং দুইটি নতুন সংযোজন; ক্যাম্পিং, ফল কসটুম পার্টি সফলভাবে আয়োজন করেছি। প্রবাসীর নুতন ওয়েবসাইট (www.PBCAusa.org) -এর আবির্ভাব এ বছরেই। আমাদের সকল কর্মকান্ড, সময়সূচী এখন শুধুমাত্র কয়েকটি ক্লিকের ব্যাপার। ঘরে কিংবা অফিসে, যেখানেই ইন্টারনেটের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানেই আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে প্রবাসীর আগামী অনুষ্ঠানের বিষয়, স্থান ও সময়সূচী জানতে পারবেন। আমাদের সকল অনুষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে আয়োজনের জন্য যারা আমাদের সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

বড়দিনের তাৎপর্য হল, খ্রীষ্টিয় আদর্শ, শান্তি, ঐক্য, ভালবাসা, নম্রতা ও সেবার প্রতীক। শুধুমাত্র "শুভ বড়দিন", "মেরী ক্রিসমাস" বা উপাসনালয়ে শান্তি রাজার জয়শ্রুতিগান এবং বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব পালন অপূর্ণ থেকে যায় যদি খ্রীষ্টিয় প্রেম সকলের কাছে পৌঁছে দিতে না পারি।

আসুন, বড়দিনের মুক্তির বার্তা সমস্ত ঘরে ঘরে পৌঁছে দিই যেন সকলের বড়দিন সার্থক, তাৎপর্যপূর্ণ, সুন্দর ও আশির্বাদে পরিপূর্ণ হয়। "শুভ বড়দিন"।

- রিচার্ড বিশ্বাস

ফাদার ষ্ট্যানলীর শুভেচ্ছা বাণী

'হবে তাঁর আগমণ
আমরা অনুক্ষণ রয়েছি প্রত্যাশায় মুক্তি প্রতিক্ষায়
হবে তাঁর আগমণ।
লভিব মুক্তিপণ লভিব পরিত্রাণ তাঁরি মহা করুণায়।
হবে তাঁর আগমণ।'
(গীতাবলী ৩৬৯, কথা ঃ মতিলাল দাস, সুর ঃ সুশীল বাড়ৈ)

প্রতিটি বাঙালি খ্রীষ্টভক্তের কাছে উপরোক্ত শব্দগুলো অত্যন্ত শ্রুতিমধুর সুরধ্বনির মধ্য দিয়ে খুবই স্মরণীয়। বিশেষ করে ডিসেম্বর মাসে রোববারের খ্রীষ্টযাগের শুরুতে সুরেলা এই ধর্মীয় সঙ্গীত আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মানব জাতির ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু আবারো আমাদের মাঝে আসছেন। এই সময় আমরা সর্বান্তকরণে চেষ্টা করি যীশু খ্রীষ্টের আগমণের পথ প্রশস্ত করে তাঁর জন্ম জয়ন্তী পালন করতে। খ্রীষ্টের ধরায় আগমণের দিনটি শীত ঋতুর সময়ের বিচারে ছোট একটি দিন হতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক ও ঐশ্বরিক কারণে দিনটি বাঙালি খ্রীষ্টভক্তদের কাছে 'বড়দিন' হিসেবেই অভিহিত। সে জন্যে আমরা ঘটা করেই, বড় আকারেই এই দিনটি পালন করি। একই জন্মোৎসব সকল মানব জাতির জন্যে, সারা বিশ্বের জন্যে। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম মানব জাতির ইতিহাসকে পরিপূর্ণ করেছে, সমগ্র মানব জাতিকে ঈশ্বরের কাছে টেনেছে এবং ঐশ্বরাজ্যের নাগরিক করেছে। এ জন্যেই বড়দিনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। আগমণ কালীন প্রার্থনা, ত্যাগ, ধ্যান, তপস্যা ও দয়ার কাজের মধ্য দিয়ে সকল খ্রীষ্টভক্ত সুযোগ পায় খ্রীষ্ট প্রভুকে নিজেদের হৃদয় গোশালায় জন্ম দিতে ও তাঁর মধ্য দিয়ে মুক্তিপণ লাভ করতে এবং তাঁর মহা করুণায় সিক্ত হয়ে পরিত্রাণ লাভ করতে। যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাশিত আগমণের আনন্দ, তাঁর প্রদত্ত মুক্তি ও পরিত্রাণের বাণীকে লেখনীর মাধ্যমে 'প্রবাসী বাঙালি খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন' তাদের মুখপত্র 'তেপান্তরী'তে প্রকাশ করছে। এটা সত্যি আনন্দ ও গর্বের বিষয়। বড়দিনের আনন্দ-উৎসব সত্যিকার অর্থে দীর্ঘ হোক সকলের জীবনে এবং নববর্ষ বয়ে আনুক সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য, এই প্রার্থনা আমার যাজকীয় আশীর্বাদসহ-

ফাঃ স্ট্যানলী গমেজ(আদি)

নরবার্ট মেন্ডেসের শুভেচ্ছা বাণী

বৎসর পরিক্রমায় শেষ প্রান্তে আসে প্রতীক্ষিত বড়দিন। একটি শিশুর জন্ম আমাদের আনন্দ! মারীয়ার কোলে শিশু যীশু। পাশে যোসেফ পালক পিতা, বেথলেহেমের পবিত্র পরিবার এবং প্রথম রাতের স্বর্গীয় ও সঙ্গীত স্বর্গ উন্মোচিত ধরার মাঝে- স্বর্গের শান্তি পৃথিবীতে।

আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের এই অস্থির সংসারে, এত হিংসা, দ্বন্দ্ব, সংঘাতের মাঝেও মানুষের অন্তরে সবার সাথে মনে প্রাণে মিলিত হয়ে থাকার পবিত্র বাসনা যেন জাগ্রত হয়ে থাকে এবং শান্তির জন্য প্রয়োজনও শক্তি ও সামর্থ এনে দেয়। সোর্স এন্ড সল্যুউশন ইঙ্ক এর পক্ষ থেকে সবার জন্য বড়দিনে নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল।

নরবার্ট মেন্ডেস্

সভাপতি

সোর্স এন্ড সল্যুউশন ইন্ক, নিউইয়র্ক

এক নীরব রাতে বেথলেহেমে

- নিকোলাস এস. অধিকারী, ক্যালিফোর্নিয়া

"'টিন-এজ'-এর কোন স্কুল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রী পাঠ্যবই পড়ার ফাঁকে লুকিয়ে কোন থ্রিলার পড়েনি"- একথা সে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

গল্পের বই পড়ার মজাটাই আলাদা রকমের। তা যদি হয় দস্যু মোহন বা শার্লক হোমস বা রানা সিরিজের কোন বই, তাহলে তো আর কথা নেই। অনেক ছেলেমেয়েই স্কুল পাঠ্যবই-এর নীচে গোপনে গল্প বই খুলে রাখে। সুযোগ পেলেই বই পাল্টে যায়। মজার ঘোরে সে এপাশে-ওপাশে তাকাতে ভুলে যায়। বড়ো বোন যখন কানটি ধরে টান দিয়ে বলে, 'এই বুঝি তোমার স্কুলের বই পড়া?' তখন হুশ হয়। অবশ্যই লুকিয়ে পড়ার রস-আস্বাদন তুলনাহীন। কেন? না, রহস্যগল্পের নেশাটা বা মনের মধ্যে গড়া স্বপ্নটা আরো কারো সাথে ভাগ করে উপভোগ করার মত নয়। এম.পি.থ্রি ও ইয়ার ফোনে গান শোনার আবেদন ঠিক এমনি।

গীর্জাঘর বা মান্ডলিক সভায় পরিচালক বক্তৃতা দেওয়ার সময় ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর গল্প বলেন। উদ্দেশ্যঃ বক্তব্যকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা, আর তা শ্রোতার মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া। তাছাড়া শ্রোতাদের উড়ু উড়ু পাগলা মনটাকে বেঁধে রাখাই আসল কথা। না হলে তারা বসে বসেই ঘুমে ঢুলে পড়েন।

প্রভু যীশু তার প্রচারে জনগণকে ও শিষ্যদের শেখাতেন দৃষ্টান্ত বা ছোট গল্প দিয়ে। তালন্ত, চাষীর বীজ বোনা, হারানো সিকি, অপব্যয়ী পুত্র - এমন অনেক উদাহরণ আছে। মনে হয় যীশুর প্রচার কাজে শিষ্যেরা কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে ঢুলে পড়তেন। তাই এই টেকনিক। ভালো করে পড়লে ও লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে দু'হাজার বছর আগে যীশু ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক, সফল প্রচারক, নির্ভিক সমালোচক। তিনি তাঁর কথায় এমন সম্মোহন সৃষ্টি করতেন যে, লোকেরা তাঁর কথা বার বার শুনতে চাইতো! ব্যক্তি বিচারে ঈশ্বর-পুত্র অনন্য ও অদ্বিতীয়। কারণ, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই, সোজা করে বলতে গেলে, তাঁকে ঘিরেই বর্তমান পৃথিবীতে সবচে বেশী বই পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এবং হতেই থাকেব।

আজকাল চালু আছে 'যোক' (Joke)। এর গভীর রসটুকু হঠাৎ করে বুঝে ফেলে অনেক শ্রোতা হাসিতে ফেটে পড়েন, কেউ কেউ মুচকি হাসেন। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে - মা-মাসীদের কাছে 'ঠাকুরমার ঝুলি' - থেকে প্রাচীন গল্প শোনা গল্প বই পড়া, মনের হাসি-খুশী ভাব, নির্মল আনন্দ - এসব কিছুই আমাদের শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে, ছোট-খাটো রোগ-পীড়াকে কাছে আসতে দেয় না। এগুলো শরীরের জন্য মেডিসিনের চেয়েও বেশী কাজ করে।

এবার 'বড়দিন' বা যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন প্রসঙ্গে আসা যাক। বড়দিন -এর ঘটনা গল্প নয়। একটি কাহিনী। একটি 'Epic' বা মহাকাব্যের শুরু। শুরুটা অত্যাশ্চর্য-অলৌকিক-চমকপ্রদ। পারিপার্শ্বিকতা ও ঘটনার বুননে ঠাসা। বর্তমানে প্রকাশিত থ্রিলার-এর চেয়েও রহস্যভরা। মানুষ-মারার কারিগর হালাকু খান, হিটলার, ইয়াহিয়া খানের মত এক হেরোদ রাজাও আছে এর মধ্যে খল-নায়ক হিসাবে।

সমগ্র মানব সন্তানেরা তাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনটা কেউ শুক্রবার, কেউ শনিবার, আবার কেউ রবিবার নির্দিষ্ট করে নিলেও সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় প্রভু যীশুর জন্মদিনটা ২৫-এ ডিসেম্বর স্থির করে নিয়েছি। ভাগ্যিস বাঙালীদের রবিঠাকুরের জন্মদিনটা ২৫-এ বৈশাখের মতো, বাঙালী খ্রীষ্টিয়ানরা বড়দিনকে নয় বা দশই পৌষ নির্ধারণ করে নেয় নি! তাহলে এ বাংলায় ও ও-বাংলায় পর পর দু'দিনে 'বড়দিন' পালন করা হতো!

শুণ্যের 'ওজন' স্তর ও গে-াবাল ওয়ার্মিং'-এর জন্য পৃথিবীর কোন কোন জায়গাতে আবহাওয়ার হেরফের হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে বড়োদিনের কাছাকাছি সময়টা অর্থাৎ পৌষের আবহাওয়া অত্যন্ত প্রীতিকর, সহনশীল ও ক্ষুধাবর্ধক। ইতিহাস-খ্যাত ইলিশ বাদে সুস্বাদু মাছ সব পাওয়া যায়। শাক-সব্জি, ফল-ফলাদিতে হাট-বাজার ভর্তি। বৃষ্টি-কাদা নেই বলেই গাড়ীতে বা বাসে চেপে এদিক-সেদিক বেড়াতে যাওয়াটাও বেশ আনন্দদায়ক। বিশেষ করে গ্রাম-গঞ্জের দিকে। গাঁ ও মেঠো পথের টান অবহেলা করা যায় না। পৌষ-মাঘের খেজুরের রস ফোঁটায় ফোঁটায় হাড়ির মধ্যে জমে আছে। অতি ভোরে কচি-কাঁচাদের কল-কাকলী। হয়তো খেজুর গাছ-কাটার 'শিউলীর'-র কাছ থেকে কে আগে রস নেবে। ছোট্ট এক খুকী ঘন কুয়াশাকে 'হাওয়াই-মিঠাই' এর মতো হাতের মুঠোয় ধরতে যায়। না পেরে অবাক হয়ে যায়। উঠানের কোণে পরতে পরতে রাখা ইরি ধান। বাঙালীর পুরাতন জাতের ধানকে হটিয়ে দিয়েছে ইরি। কেন হটাবে না! একটা ইরির ছড়ায় একশ' পঞ্চাশের ওপর শস্য-দানা ফলে। যে জমিতে আগে ফলত বিশ মন ধান সেখানে ইরিতে পাওয়া যায় ষাট মন। ভাবা যায়! ধানের সোনা সোনা রঙ ও প্রচুর ফলন সারা বছরের ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত দিনগুলোর ইঙ্গিত বয়ে আনে। 'ভাইটাল' বা 'আতপ' চালের গুড়ো মানেই পিঠার পরমান্ন!

বছরের শেষ বড় উৎসব। তাই নতুন পোষাক কেনার জন্য ছেলেমেয়েদের হরেক রকমের বায়না। স্কুল-কলেজ ছুটি। সবারই খুশী খুশী ভাব। সারাদিনের ক্লান্তিকর কাজের শেষে মা, বাবাকে ডেকে বলেন, 'জানো, এসময়ে সবাইকে খুশী দেখলে প্রাণটা ভরে ওঠে। মনে হয় ঘরের শ্রী যেন ফিরে এসেছে।' এক সুলেখকের মতে, "ঘর-বাড়ী হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে জীবনসূতোর এক দিকটা বাঁধা থাকে। সূতোর অন্য দিকটা ধরে ঘরের লোক যেখানে খুশী ঘুরতে যায়। ঠিক সন্ধ্যায় আবার ঘরে ফিরে আসে।"

বাংলায় পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বছর আগে বড়দিন যেভাবে পালন করা হতো, সেই 'ট্র্যাডিশন' প্রায় এখনো তাই আছে। অন্ততঃ গ্রাম-বাংলায় ত' বটেই। গান। ঝলমলে নতুন পোষাক। শহুরে চাকুরীজীবিদের গ্রামের বাড়িতে ফেরা। আত্মীয়-স্বজন। ঘরে ঘরে নেমন্তন্ন। আর স্বল্পকালীন অবস্থান। সবচে' মজা, গ্রামের প্রায় দূষণহীন মুক্তবাতাস ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তে, স্নায়ুতে, মাংসের কোষে কোষে ভরে নেয়ার অপার আনন্দ!

এবার দেখা যাক, কয়েকটা দেশে বড়োদিনকে স্বাগতঃ জানানোর বিশেষ প্রস্তুতি। স্পেনীশরা বড়দিনে ডিম, বাদাম, মধু ও চিনি দিয়ে বিশেষ মিষ্টান্ন রান্না করে। ২৪এ ডিসেম্বর রাত ১২টায় গীর্জার ঘন্টা পড়ার মুহূর্তে অনেকেই ১২টা আঙুর ফল খেয়ে বড়দিনকে স্বাগত জানায়। এছাড়া ৬ই জানুয়ারী, প্রাচ্যের তিন পন্ডিতের কাছে খ্রীষ্ট যীশুর প্রকাশের (এপিফানী) আগের রাতে ৩টা উটের খেলনা দিয়ে ঘর সাজায়। ফ্রান্সে প্রচলন আছে, রাত ১২টায় ১২টা আঙুর ফল ও ১৩টা বাদাম খাওয়ার। মেক্সিকানরা ভূট্টার খোসার মধ্যে ভূট্টার ছাতু, মাংস ও গরম মশলা দিয়ে 'Hot Tamalas' তৈরী করেন। রুমানীয়রা বাঁধাকপি ও সসেটসহ ওয়ালনাট কেক খেতে ভালবাসেন। অষ্ট্রিয়ায় প্রচলন আছে গরুর বাছুর মেরে তার পাকস্থলী টুকরো টুকরো করে তার 'সুপ' খাওয়ার। হাইতিতে চাল, সিমসহ ছাগলের মাংস রান্না করলে যে খাবার তৈরী হয় তার নাম 'ডুরিস এভেস পোয়া' (Duriz Avec Pois)।

এবার ফিরে চেয়ে দেখি দু'হাজার চার বছর আগের এক ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ 'নীরব ও পূণ্য রাতে'র দিকে। প্রভু যীশুর পালক পিতা যোসেফ ও মা মরিয়ম জীবন সূত্রের এক দিকটা নাসারতে বেঁধে রেখে প্রচন্ড শীতের মধ্যে বেথলেহেমে গেলেন কৈসরের আদেশে নাম লেখাতে। এ ঘটনাই যীশুর জন্মের পটভূমি। যদিও যীশুর জন্মের ভবিষ্যৎবাণী ছিল বহু আগে।

ভেবে দেখা যাক। প্রাকৃতিক আবহাওয়া, শহরের পান্থশালায় ঠাসাঠাসি করে লোকজন থাকা, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ যোসেফ ও আসন্ন প্রসবা মরিয়ম। অবস্থার প্রেক্ষিতে যোসেফ ও মরিয়ম-এর জন্য সময়টা কি শুভ ছিল? মোটেই না। যেমন - এক, মা মরিয়মের 'ইমারজেন্সী ট্রান্সপোর্ট'-এর জন্য কোন এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা ছিল না। দুই, কোথায় ডাক্তার, কোথায় নার্স? তিন, কোথায় আই.সি.ইউ (ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট - অত্যাবশ্যক যত্ন নেবার বিশেষ কামরা)? এর ত' কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। চার, (বিশেষ লক্ষ্য করুণ) ইংল্যান্ডের রানীকে রাজকীয় কাজে বয়ে নিয়ে যায় 'সোনার রথ' - আর যীশু রাজমাতার জন্য দন্ডায়মান ছিল একমাত্র বাহন একটি 'গাধা'!

রাজাদের রাজা, প্রেসিডেন্টদের সুপ্রীম প্রেসিডেন্ট - তাঁর জন্য 'সোনার গাঁ'-এর মতো ফাইভ ষ্টারের কোন 'সুইট' বরাদ্দ হল না। স্থান হলো কার্বন -ডাই-অক্সাইডে দূষিত, জানালা-ভাঙ্গা 'গ্যারাজে'। নিয়তির লিখন এমনি - "এই ব্যাটা ঈশ্বর-পুত্র! সূচাগ্র মেদিনী থেকে অনেক বেশী জায়গা তোমাকে ছেড়ে দেয়া হল। অবশ্য গোশালায় থাকার জন্য তোমাকে কোন রেন্ট দিতে হবে না। খড়কুটো, যাবপাত্র এগুলো বাড়তি পেয়েছ!"

বাংলার এক মায়ের মত, মা-মরিয়ম নবজাতকের জন্য পুরাতন শাড়ী দিয়ে তৈরী ছোট কাঁথা ও জামাকাপড় সঙ্গে নিয়েছিলেন ভাগ্যিস। যোহন (বাপ্তাইজক)-এর মা এলিজাবেথ মরিয়মকে হয়তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বোন, টুক-টাক জিনিষপত্র গুছিয়ে দিলাম। সঙ্গে নিতে ভুলে যাসনে। নইলে শীতের হাওয়া কাবু করে ফেলবে ছেলেটাকে।' মরিয়মের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে একবিংশ শতাব্দীর দশ বছরের এক মেয়ের মন্তব্য শুনুন, "মা, তিনজন জ্ঞানী পুরুষ প্রভূ যীশুর জন্য স্বর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধরস নিয়ে গিয়েছিল। শুনতে ভালোই লাগে। তবে ঐ তিনজনের মধ্যে একজন যদি মহিলা হতেন, তবে তিনি অবশ্যই অবশ্যই যীশুর জন্য 'ডায়াপার' নিয়ে যেতেন।' সাব্বাস মেয়ে! তোমার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ।

'এয়ার কন্ডিশন্ড' গোশালা - আকাশ কুসুম কল্পনা! তবে 'প্রকৃতি-মাতা' শিশু যীশুকে ধরায় বরণ করার জন্য নিশ্চয় কোন পরিকল্পনা করেছিলেন। তা' আমাদের

জানার উপায় নেই হয়তো। কারণ, মাতা মরিয়ম যীশুর জন্ম বিষয়ক 'প্রেস কনফারেন্সে' স্টেটমেন্ট হয়তো দিয়েছিলেন। কিন্তু সুলেখক সাধু চতুষ্টয় মথি, মার্ক, লূক, যোহন তা' বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন মনে হয়। আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এভাবেও কল্পনা করতে পারে। এক, গোশালা ছিল পান্থশালার এমন দিকে, যেখানে শীতের হু হু বাতাস খুব বেশী একটা ঢুকতে পারে নি'। দুই, পশুখাদ্য 'বিচালী' শীতের সময় এক ওম-এর সৃষ্টি করে। যাকে সবাই বলি 'ইনসুলেশন'। ইনসুলেশনের কাজই হল ঠান্ডা বা উত্তাপের তীব্রতাকে কমিয়ে দেয়া। তিন, পশুখাদ্য ধরে রাখা 'জাবপাত্র'ও ভালো ওয়ার্মারের কাজ করেছিল বৈ কি!

স্বর্গদূতদল-প্রধানের বার্তা ছিল এরকম, "শোনো ভাগ্যবান রাখালগণ! এক রাজার জন্মের শুভ-সংবাদ তোমরাই আগে পেলে। পান্থশালার মালিক, বেথলেহেমে আসা অতিথিবৃন্দ আর কনকনে তুষার-পাত, বৈরী আচরণ করলেও তোমরা নবজাত শিশু যীশুকে জাবপাত্রের উষ্ণতায় হাত-পা নেড়ে উল্লাস করতে দেখবে। যাও দেখে নয়ন জুড়াও। আর ভয় পেয়ো না। আমাদের পরিচ্ছদের আলোর তীব্রতা আর ওড়ার গতি দেখলে ক্ষেপনাস্ত্র মিসাইলের মত লাগবে। আসলে আমরা তা নই। আমরা মানুষের ক্ষতি করি না। স্বর্গের রাজাধিরাজের কাছ থেকে আমরা খুশীর সংবাদ বয়ে আনি সবার জন্য। ঔ নতুন তারা তোমাদের পথ দেখাবে। ইম্মানুয়েল। সকলের শান্তি হোক।"

এবার মা মরিয়ম ও পৃথিবীর নর্দার্ণ (ধনী দেশগুলো) অঞ্চলের ধনী-গ্রুপের বর্তমান সন্তান-প্রসবিনী মায়ের অবস্থার কথা তুলনা করা যাক। এক, বর্তমানের আসন্ন সন্তান প্রসবিনী মাতাকে সন্তানের জন্মদানের আগে, মরিয়মের মত পশুর পিঠে বা এ্যাবড়ো-থ্যাবড়ো রাস্তা দিয়ে যেতে রিক্সায় বা বাসে চাপতে হয় না। দুই, প্রসূতি সদনে 'সিটের' অভাবে মরিয়মের মত একাকীত্বেও কাউকে ভুগতে হয় না। এখন ত' মা-মাসী, দিদিমা-ঠাকুমা, পাদ্রী-পুরোহিত সাহেব এবং আরো আরো লোক রুমের বাইরে 'কিউ'-এ দাঁড়িয়ে থাকেন - কখন তার পালা আসবে নবজাতক - দর্শনের।

আসলে, মনে হয়, সেই রাতে মা মরিয়মের শারীরিক, মানসিক ও স্নায়ুর জোর ছিল অত্যন্ত বেশী। ধরুন, বর্তমানের এক নামকরা হাসপাতালের একজন ঝানু প্রতিবেদক 'টাইম মেশিনে' চড়ে অতীতের দিকে যেতে যেতে দু'হাজার চার বছর আগের সেই রাতে বেথলেহেমে পৌছলেন। উজ্জ্বল তারা দেখে তিনি বুঝলেন ঠিক জায়গামত এসেছেন।

পরদিনে প্রেস কনফারেন্সের জন্য তৈরী হয়ে গোশালা ঘরে গিয়ে তার ' টেপ রেকর্ডিং' মেশিন চালু কের বললেন, ' পূজনীয় মা জননী মরিয়ম)

আমার প্রথম প্রশ্ন ঃ বিগত সন্ধ্যায় প্রচন্ড শীতে আপনার স্বামী যোসেফ যখন আপনাদের জন্য কোন স্থান পাচ্ছিলেন না, তখন তার মনের প্রতিক্রিয়া কি ছিল ?

মরিয়মের উত্তর ঃ আপনারা জানেন তবু বলছি। আমার স্বামী একজন ভালো সূতার মিস্ত্রি (Carpenter)। ওনার আগের পক্ষের স্ত্রীর কয়েকটা ছেলে মেয়ে আছে। তাই সংসারের জন্য তার বেশ খাটতে হয়। আর যে কোন প্রতিকুল পরিস্থিতিতে উনি ভেঙ্গে পড়েন না। গোশালাটা যে পাওয়া যেতে পারে তা' তিনি আগে বুঝতে পেরেছিলেন। সরাইখানার মালিককে উনি ঠিক এমনিভাবে বলেছিলেন, ' দেখুন, আপনার মত সৎ লোক খুব কম দেখেছি। আপনার 'হ্যা' সবসময় 'হ্যা' হয়। সরাইখানায় যে কোন 'রুম' পাওয়া যাবে না, তা আপনার কথাতে বুঝেছি। তো, আপনি কি আপনার রান্নাঘরটা আমাদের জন্য ছেড়ে দেবেন ? না গোশালা দেবেন ?' এখন মালিককে ত' একটা দিক ছেড়ে দিতেই হয়। যোসেফের কথায় মালিক তুষ্ট হয়ে মাথা চুলকে বললেন, ' আপনারা গোশালা ঘরটাই নিন। কারণ ওখানটায় যে রাত কাটানো যায় তার একটা এ্যাডভারটাইজমেন্ট (Ad) দরকার।'

প্রতিবেদক - ' আমার ২য় প্রশ্ন ঃ প্রভু যীশু জন্মের সময় মহিলা হিসাবে আপনি একা ছিলেন। প্রচন্ড ঠান্ডার আক্রমন ও সন্তান -জন্ম-সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি আপনি কীভাবে নিয়ন্ত্রন করলেন ?

মরিয়মের উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের প্রথম কথাটা ভুল। আমি কখনো একা নই। আমি প্রভুর দাসী। তাই তিনি আমার পাশে পাশে ছিলেন। আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর হচ্ছে - শিশু যীশুর জন্মের ক্ষণটাতে কয়েকজন সাদা পোষাকধারী 'নার্স' - এর উপস্থিতি আমার চোখে ভাসছে। আর ঠান্ডার কথা বলছেন ? জানেন তো শীতে এখানে বৃষ্টি হয় । গতরাতে টিপটিপ বৃষ্টি, কনকনে বাতাসের ঝাপটা ও হাল্কা তুষারপাত হচ্ছিল। ঠান্ডাটা আপনাদের আলাস্কার সাথে তুলনা করতে পারেন। তখন ঐ নার্সদের জোড়া - জোড়া পাখা পাশাপাশি রেখে - ঐ যে আপনারা বলেন আই. সি. ইউ - তার কাছাকাছি কিছু একটা হয়েছিল হয়তো। তাছাড়া বেথলেহেমের উট, ছাগল আর ভেড়ার একটা দল গোশালার চারিদিকে ঘিরে একটা উষ্ম দেয়াল তৈরী করেছিল রাতে। এখন ওরা মাঠে। তাই দেখতে পাচ্ছেন না।

প্রতিবেদক ঃ আমার তৃতীয় প্রশ্ন ঃ ' আই. সি. ইউ' আপনি কেমন করে জানলেন ?

মরিয়মের উত্তর ঃ ঐ যে আপনার টুপিটার একপাশে অরামিয় ভাষায় লেখা দেখতে পাচ্ছি।

প্রতিবেদক ঃ আমার শেষ প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথমজাত সন্তানের জন্মদানে আপনার মনের কথা পৃথিবীর সকলের কাছে পৌছাতে আপনি কিছু বলবেন কি?

মরিয়মের উত্তর ঃ পৃথিবীব্যাপী উপাসনালয়, গীর্জা, ধর্মধাম - যাই বলুন - সবজায়গাতেই গতরাতের ঘটনাটা জাঁকজমকভাবে উদযাপিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার জিনিষপত্র দেখে ও কথাবার্তা শুনে বুঝেছি আপনি সময়ের 'উজানে' চলে এসেছেন। ফিরে গিয়ে আমার অত্যন্ত আনন্দের ও খুশী - খুশী ভাবটা সবার সাথে উপভোগ করুন। আর কষ্ট আমিও কম পাই নি একেবারে! তাই আমার শেষ কথা। পৃথিবীর অবহেলিত,অনাহারী লোকদের কথা ভাবুন। বিবাদলিপ্ত মানুষ এবং মানুষমারা যন্ত্রপাতি ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মানবজাতির একাংশের কথা সবাইকে ভাবতে বলুন। দয়াকরে রাষ্ট্রনায়কদের কর্তব্যের কথা সোচ্চারে প্রচার করুন। ঐ মানুষগুলো তো যোসেফ ও আমারই সমগোত্রীয় - খেটে খাওয়া মানুষ ! এবার তাহলে আসুন। ঐ যে মেষ রাখালরা হৈ চৈ করতে করতে আসছে। ওদের স্বাগত জানাতে হবে। মানব-সমাজে প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হোক। ইম্মানুয়েল।

প্রতিবেদক হৃষ্টচিত্ত হলেও মনের কোনে এক ছোট্র নিরানন্দের মেঘ নিয়ে ফিরে এলেন - 'পাপতাপ -ভার গহন-আঁধার' এই ভূপৃষ্ঠে! তিনি ভাবছেন, ঐ ছোট্র মেঘ কি কেটে যাবে ? না, দিগন্তব্যাপী ছেয়ে যাবে কালবৈশাখীর মত ? প্রসঙ্গত ঃ বলা যায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে, চ্যানেল ৪ এ প্রতিবেদনটি সারা পৃথিবীতে হবে গভীর রাতে।

****

বেথলেহেমে ঐ নীরব রাতের কথা ; যোসেফ, মরিয়ম ও প্রভু যীশুর দুঃখ-কষ্টের কথা, আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। অন্তর দিয়ে অনুভব করি না। নিয়তির পরিহাস এই যে টর্নেডো, ঝড়, বন্যায় আমার ঘরের চাল উড়ে গেলে আমেরিকা-ইয়োরোপের ধনী দেশগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ত্রানসামগ্রী দরকার, টাকাপয়সা দরকার আরও কত কিছু দরকার। আমরা ধ্বংসের ওপর গড়তে আগাই না । স্বাবলম্বন শিখি না। আমাদের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে আগ্রহ নেই। আমাদের কেবলই নেই, নেই আর নেই। কবে উঠে দু'পায়ের ওপর দাঁড়াবো, শির উঁচু করবো, দেশজ সম্পদ বাড়াবো, তা' আমাদের চীন-জাপানের কাছে শেখা দরকার। ওরা অল্প সময়ে উন্নতির শিখরে উঠে আসছে বলে!

আমাদের স্মরণে রাখা ভালো, পৃথিবীর কিছু দেশে, কিছু কিছু লোক কষ্ট পেয়েই যাচ্ছে। তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। তবেই বড়দিনের আনন্দ সার্থক হবে। এছাড়া আমরা 'কথায়' বড় না হয়ে 'কাজে' বড়ো হবো। কাজ ফাঁকি দিয়ে, কাজ না করে মজুরী নেওয়া 'চৌর্যবৃত্তির' পর্যায়ে পড়ে। সেই খাঁটি মানুষ হতে হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ হচ্ছে -

"যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভ চিন্তা নয়/ যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভ কর্ম নয়/ যদি দন্ড সহিতে হয় তবু অশুভ বাক্য নয় ॥"

মোট কথা, অশুভ চিন্তা, অশুভ কর্ম ও অশুভ বাক্য যেন আমাদের কাছ থেকে দূরে থেকে আরো দূরে চলে যায়। বহু রাষ্ট্রের রাজা-মহারাজা, রানী -মহারানীগণ। অশুভ অস্ত্র দিয়ে মানুষ মেরে গর্ব করে। কিন্তু আপনারা আঁস্তাকুড়ে মরে পচে যাবেন। মানুষের দুঃখকে জয় করে অনেকেই মহামানব হয়ে ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

মনোনীতা মরিয়মের কষ্টের সাথে আর একজন ঈশ্বর -কতৃক মনোনীত নেতার কষ্টের তূলনা করার মতো। উপসংহারে একটা 'যোক' (Joke)-এর উলে-খ করার লোভ সামলাতে পাচ্ছি না।

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজের পাশের রাস্তা দিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ মর্নিং ওয়াকে বার হয়েছেন। হঠাৎ তার সামনে এক পক্ককেশ বৃদ্ধের সংগে দেখা। তাঁর হাতের লাঠি, চুল, দাড়ি ও পরিচ্ছদ দেখে তিনি ঠিক চিনে ফেললেন উনি মোশী। কিন্তু কী আশ্চর্য। বৃদ্ধের চোখ প্রেসিডেন্ট বুশের দিকে পড়া মাত্রই তিনি রাস্তার উল্টো দিকে ঘুরে দ্রুত হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন একই ঘটনা চতুর্থ দিন প্রেসিডেন্ট বুশ দ্রুত তার কাছে গিয়ে করমর্দন করে বললেন, 'তিনটে দিন আমাকে একটু 'উইশ' করলেন না। ব্যাপার কী খুলে বলুন।'

মোশী বললেন, ' এক বুশের (জ্বলন্ত ঝোপ) সামনে গিয়ে কথা বলে আমি সেদিক চষে বেড়িয়েছি। আবার এক বুশের সঙ্গে কথা বলে ...."

মোশী কষ্টে কাটিয়েছেন চৌদ্দ হাজার ৬শ ১০ টি কষ্টকর দিন-রাত। আর ধন্যা মরিয়ম একটা বিশেষ রাত থেকে শুরু করে তেত্রিশ বছর কাটিয়েছেন। সেই প্রথম রাতটা 'নীরব রাত, পুন্য রাত' আখ্যা পেয়ে অনেককাল অমর হয়ে আছে ও থাকবে।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ২০০৫ বর্ষ সবার জন্য আনন্দের ঢালি বহন করে ঘরে ঘরে আনন্দ বিতরণ করুক। ইম্মানুয়েল।

খ্রীষ্টান গৃহ খ্রীষ্টেরই গৃহ

- যেরোম ডি' কস্তা, টরেন্টো, কানাডা

পাশ্চাত্যের একটি মহানগরী। নগরীর উপকণ্ঠে সারি সারি গৃহের সমারোহ। সবুজ বৃক্ষাদি ও মনোরম ফুলের বাগানসহ দু'তলা একটি বড় সাইজের বাড়ীতে পিতামাতা, দু'পুত্র ও এক কন্যার বাস। এক পুত্র কলেজে, আরেক পুত্র হাইস্কুলের শেষ পর্যায়ে এবং কন্যাটি স্কুলের মধ্যম পর্যায়ে অধ্যয়নরত। পিতামাতার আয় ঈর্ষনীয় অংকের। দু'জনের দু'টি গাড়ী - সম্প্রতি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী জেষ্ঠ্যপুত্র শীঘ্রই আরেকটি গাড়ীর মালিক হতে আগ্রহী।

গৃহ-প্রবেশের দরজার অদূরেই বসার ঘর। এ ঘরে ঢুকলে সহজেই চোখে পড়ে আমেরিকান জননন্দিত উদ্ভিন্ন যৌবনা গায়িকা ব্রিটনী স্পিয়ার্সের অশোভনভঙ্গীর বড় একটি ছবি। অন্য দেওয়ালগুলোতে পারিবারিক ফটোসহ কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঝুলছে। ঘরের এক দিকে রয়েছে ঢাউশ - সাইজের একটি টেলিভিশন, ডিভিডি পে-য়ার, সিডি ক্যাসেট পে-য়ার এবং ভিসিআর।

ছেলেমেয়েদের ঘরেও তাদের পছন্দানুযায়ী তারুণ্যে উচ্ছল চলচিত্রের নায়ক-নায়িকা ও গায়ক-গায়িকার বিভিন্ন ভঙ্গীমার ছবি। ড্রেস-ক্যাবিনেট ভর্তি অতি সাম্প্রতিক ফ্যাশনের পোশাক - আশাক। প্রত্যেকের ঘরেই একটি করে সিডি ও ক্যাসেট পে-য়ার এবং নানা রং ও ঢং এর সিনেমা ও মিউজিক ম্যাগাজিনের সমারোহ।

শেলফে স্থান পেয়েছে স্কুলে পড়াশুনার প্রয়োজনীয় বই ও খাতাপত্র। বড় সন্তানের ঘরে বাড়তি একটি টেলিভিশন। পিতামাতার ঘরটি হচ্ছে মাস্টার বেডরুম। সেখানে কিং সাইজের বিছানাসহ মানানসই আসবাবপত্র। পরিবারে পাঁচজন মানুষের চারটি সেলফোন। রান্নাঘরে রয়েছে স্বল্পায়াসে ও স্বল্পসময়ে রান্নায় সহায়ক সর্বাধুনিক সামগ্রী। বড় বড় পার্টির আয়োজন ও অতিথি আপ্যায়নের জন্য রয়েছে বেশ বড় একটি এন্টারটেইন্টমেন্ট রুম। আরও আছে বছরে বিভিন্ন সময়ের উপযোগী মদ্যসামগ্রীর যোগান।

এ পরিবারে কি নেই? আছে জাগতিক ভোগ ও আনন্দ-উল-াসের সব আয়োজন। এতসব থাকার পরও দেখা যায় সেখানে আছে একটি অভাব - বড় একটি অভাব। এটি খ্রীষ্টান পরিবার হলেও সদস্য-সদস্যাদের আত্মিক দিকটি ভীষনভাবে অবহেলিত। খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ ও আত্মিক চর্চার অনুশীলনের প্রয়েঅজনীয়তা রয়েছে। পরিবারে আছে ভোগ, নেই ত্যাগ; আছে আনন্দ, নেই অভাববোধের যাতনা। আছে জাগতিকতার চরম চর্চা, নেই আত্মিক বৃদ্ধির বিশেষ কোন চেষ্টা। খ্রীষ্টান হিসেবে - অর্থাৎ ত্রানকর্তা যীশুখ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে - তারা যে তাদের ত্রানকর্তা খ্রীষ্টকে তাদের জীবনের মধ্যমনি করার কথা, তা তারা বেমালুম ভুলে বসে আছেন। যীশুখ্রীষ্টকে সন্মানপ্রদর্শনের বাহ্যিক চিহ্নস্বরূপ কোন ঘরেই যীশুখ্রীষ্টের কোন ছবি বা ক্রুশ স্থান পায়নি। উপরন্তু নিয়মিত প্রার্থনার জীবনও এ পরিবারে বিশেষ উৎসাহিত হচ্ছে না। এককথায় বলা যায়, পরিবারটি খ্রীষ্টান পরিবার হিসেবে খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্যদানে সফল হতে পারেনি।

যীশুখ্রীষ্ট নিজেই বলেছেন, "কিন্তু শাস্ত্রে (দ্বিতীয় বিবরণ ৮ঃ২-৩) লেখা আছে ঃ 'শুধুমাত্র রুটি খেয়ে নয়, বরং ঈশ্বরের শ্রীমুখে উচ্চারিত প্রতিটি বানীকে সম্বল করেই মানুষকে বেচেঁ থাকতে হয়।' " (মথি ৪ ঃ ৪)

তিনি আরও জানিয়েছেন যে, দেহ ও আত্মা নিয়েই মানুষ। তিনি বলেন ঃ "মানুষের দেহটাকে যারা মেরে ফেলে, কিন্তু তার আত্মাকে মারতে পারে না, তাদের ভয় করো না তোমরা! বরং ভয় করো তাঁকেই, যিনি আত্মা আর দেহ, দুই-ই নরকে ধ্বংস করতে পারেন। ... সুতরাং মানুষের সামনে যে কেউ স্বীকার করবে, সে আমারই একজন, আমিও তাকে আমার স্বর্গনিবাসী পিতার সামনে আমারই একজন বলে স্বীকার করব। কিন্তু মানুষের সামনে যে-কেউ অস্বীকার করবে, সে আমারই একজন, আমার স্বর্গনিবাসী পিতার সামনে আমিও তাকে নিজের একজন বলে অস্বীকার করব।" (মথি ১০ঃ২৮,৩১-৩৩)

কোলকাতার ধন্যা মাদার তেরেজা বলেছেন ঃ "নীরবতার ফল হচ্ছে প্রার্থনা। প্রার্থনার ফল হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসের ফল হচ্ছে ভালবাসা। ভালবাসার ফল হচ্ছে সেবা। সেবার ফল হচ্ছে শান্তি।"

সুতরাং একজন খ্রীষ্টান হিসেবে বাহ্যিক ও আত্মিক জীবনের মধ্যে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে। বাহ্যিক ও আত্মিক জীবন পৃথক পৃথকভাবে চলতে পারে না।

একটি খ্রীষ্টান গৃহ সাধারনতঃ কেমন হওয়া উচিত যেখানে খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্যদান লক্ষনীয়?

বাহ্যিক দিকঃ

গৃহটি ও তার আশপাশ পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন এবং যতদুর সম্ভব সাজানো-গোছানো থাকা উচিত।

গৃহের আসবাবপত্র ও সাজানোর সামগ্রী রুচিশীল ও সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন হওয়া উচিত।

একটি পারিবারিক লাইব্রেরী - যেখানে জাগতিক বিষয়াদির উপর প্রয়োজনীয় বইপত্র ছাড়াও আত্মিক উন্নতি ও বৃদ্ধিতে সহায়ক ধর্মীয় ও
আধ্যাত্মিক পুস্তক-পুস্তিকা থাকবে।

যারা কাথলিক খ্রীষ্টান, তারা তাদের গৃহে ক্রুশ, যীশুখ্রীষ্ট-ধন্যাকুমারী মারীয়া-সাধুসাধ্বীর ছবি ঝুলাতে পারেন। নির্দিষ্ট কোন বাইবেলের
বানী ও খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ প্রকাশক উদ্ধৃতিও ঝুলানো যায়।

যারা প্রটেস্টান্ট খ্রীষ্টান, তারা ক্রুশ, যীশুখ্রীষ্টের ছবি ও সুন্দর সুন্দর বাইবেলের বানী ও খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধপূর্ণ বানী ঝুলিয়ে রাখতে পারেন।

খ্রীষ্টান গৃহবাসীগন কথায়, কাজে ও আচরণে খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্য বহন করা উচিত।

আত্মিক দিকঃ

খ্রীষ্টান গৃহবাসীদের জীবন হবে প্রার্থনাশীল জীবন। প্রার্থনা যেমন তাদেরকে আত্মিক শক্তি যোগাবে, তেমনি তাদেরকে আত্মিক বিপদাপদ
থেকেও রক্ষা করবে। নিয়মিত প্রার্থনা তাদের জীবনের অঙ্গ হওয়া উচিত।

খ্রীষ্টান গৃহে পালাক্রমে দলীয় প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করা যায়।

পালাক্রমে একেক সপ্তাহে একেক পরিবারে বা একটি পরিবারেও নিয়মিত দলীয় বা ব্যক্তিগত বাইবেল পাঠ ও আলোচনার/আত্মচিত্তনের
ব্যবস্থা করা যায়।

কোন পরিবার এককভাবে বা দলগতভাবে খ্রীষ্টীয় বানী প্রচারের জন্য প্রার্থনা করতে পারে বা আর্থিক দান দিতে পারে।

যারা কাথলিক খ্রীষ্টান, তারা কোন যাজককে দিয়ে নিজেদের গৃহটি আশীর্বাদ করিয়ে নিতে পারেন। তাছাড়া তারা গৃহের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি ছোট আলতার বা বেদী রাখতে পারেন, যেখানে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ, ছবি ও বাইবেল স্থাপন করতে পারেন।

খ্রীষ্টান গৃহে খ্রীষ্টান ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী রাখা বাঞ্চনীয়। এসব পত্রিকা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এবং খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষাদানে সহায়ক। কাথলিক খ্রীষ্টানগণ বাংলাদেশের সাপ্তাহিক 'প্রতিবেশী' ও মাসিক 'খ্রীষ্টাব্দ', ভারতের মোম্বাই থেকে প্রকাশিত The Examiner এবং Don Bosco's Madonna এবং যারা যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন, তারা নিজস্ব ধর্মপ্রদেশীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত যেকোন একটি বা একাধিক ম্যাগাজিন রাখতে পারেন ঃ Catholic Digest, Our Sunday Visitor, US Catholic, St. Anthony Messenger, Liguorian, Catholic Faith ইত্যাদি। কিশোর-কিশোরী ও তরুন-তরুনীদের জন্যও সুন্দর সুন্দর কাথলিক ম্যাগাজিন রাখা যায়।

প্রটেস্টান্ট খ্রীষ্টানগণও যার যার প্রটেস্টান্ট মন্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত পত্রপত্রিকা রাখতে পারেন। এ ছাড়াও তারা নিম্নোক্ত প্রটেস্টান্ট ম্যাগাজিনগুলো থেকেও এক বা একাধিকের গ্রাহক হতে পারেন ঃ Christian Century, Christianity Today, Christian Parenting, Guideposts ইত্যাদি।

খ্রীষ্টান গৃহ খ্রীষ্টেরই গৃহ, কারন খ্রীষ্টান গৃহবাসীগণ হচ্ছেন খ্রীষ্টেরই অনুসারী, খ্রীষ্টেরই শিষ্য। কথায়, কাজে ও আচরণে এ গৃহবাসীদের খ্রীষ্টেরই সাক্ষ্যদানের কথা। তাদের মাধ্যমেই খ্রীষ্ট অন্যের কাছে প্রকাশিত হন। নিজেরা খ্রীষ্টময় না হলে, তাদের গৃহ কিভাবে খ্রীষ্টময় হয়ে উঠবে?

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন
www.PBCAusa.org

The Epiphany

- Tony Rozario, Woodside, NY

Did you know that Twelve days after Christmas is known as Twelfth Night or Epiphany and in Latin countries it is Dia de los Reyes Magos? It was on this night that the three kings made it to Bethlehem to present their gifts to the newborn Jesus. They brought gold, frankincense and myrrh.

In latin countries, on January 5th th three wise men are added to the nativity scene and children leave their shoes by the door and hope for fruits, candy, and trinkets to be left inside them by the Wise Men. Some countries give presents on this day rather than on Christmas Day. In Mexico, La Rosca de Reyes, a sweet circular cake is served with a doll baked inside representing the baby Jesus and is served with hot chocolate. The person who finds the baby in their slice is to host the forthcoming celebration Candelaria or Candlemas on February 2nd. It is on Candlemas that the nativity scene and all the Christmas decorations are put away.

In the USA as well as most of us, eat cake, sweets, and many different special foods during Christmas time. We also usually give our gifts on Christmas day. By the 5th of January, we have most of our decorations put away. We have many special customs that we follow during the Christmas times, and now you know some other people have and follow.

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY, 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

"এই বিদগ্ধ ধরণীর আমি এক সাধারন মানুষ"

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার।

ভাষান্তর ঃ সুবীর এল রোজারিও।

এক সময়ের বাদাম ব্যবসায়ী, মুখে যার সর্বদা হাসি, পরবর্তীতে পরাক্রমশালী মার্কিন যুক্তরাষ্টের সৌভাগ্যবান প্রেসিডেন্ট, অতঃপর নোভেল শান্তি - পুরস্কার বিজয়ী, শান্তির শ্বেত কপোত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ জিমি কার্টার। শান্তি পুরস্কার হাতে পেয়ে বিশ্ব মানবতার উদ্দেশ্যে তিনি এক মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্য প্রদানের শুরুতে, তিনি নিজেকে এই সমস্যা বিদগ্ধ ধরনীর একজন অতি সাধারন মানুষ হিসেবে তুলে ধরেন এবং বর্তমান সমস্যা সংকুল বিশ্ব সম্পর্কে আপন উপলব্ধি ব্যক্ত করেন। আমি THE NEW YORK TIMES- এ তার বক্তব্য পাঠ করি ও " তেপান্তরীর " পাঠককূলের উদ্দেশ্যে বাংলায় অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত হই।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ জিমি কার্টার বলেন , " আমার হোয়াইট হাউস ত্যাগের পর থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের এ ব্যবধানে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। আজ বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র একটি মাত্র পরাক্রমশালী দেশ যার হাতে আছে প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি, সুবিশাল এবং সর্বাধুনিক সামরিক বাহিনী। সামনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর জন্য যে বাজেট ঘোষিত হতে যাচ্ছে উহা পৃথিবীর পনরটি দেশের সম্মিলিত বাজেটের চেয়েও অধিক হবে।

বিশ্ব বানিজ্যে, বিশ্ব মানবতার কল্যাণে সাহায্য ও সম্পদ বন্টনে, মার্কিন কণ্ঠই সর্বদা উচ্চারিত হয় ও মার্কিন সিদ্ধান্তই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহীত হয়। এই প্রভু সুলভ মনোভাবের পরিবর্তন হবে কি কখনো ?

আজ থেকে প্রায় বার বছর পূর্বে রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ মিখায়েল গরবাচেভও একই শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। কারন তিনি স্নায়ু যুদ্ধের অবসানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু হায়! বিশ্ব আজ শান্তির যুগে প্রবেশের পরিবর্তে অধিক মাত্রায় বিপদ গ্রস্ত ও ভীতিকর। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের উপর অতর্কিত হামলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কোন জাতি এমনকি সামরিকভাবে প্রতাপশালী দেশও অসহায়। নিরাপদ নয় মোটেও।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যকার উত্তেজনা ও যুদ্ধমূলক মনোভাবের শান্তিপূর্ন সমাধান আবশ্যক। সম্মিলিত জাতি সংঘ এ ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্বে শান্তি স্থাপনে ও রক্ষায় জাতি সংঘের প্রধান ভূমিকা সর্বোত্তম - ইহা যদি সত্যিই আমরা মনে প্রানে গ্রহন করি তাহলে জাতিসংঘকে তার দায়িত্ব পালনে ও সকল সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা প্রদান উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সকলেই জাতি সংঘের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে - যা বিশ্ব শান্তি স্থাপনে এক নিশ্চিত প্রতিবন্ধক।

১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার ন্যায়ভিত্তিক আশু সমাধান প্রয়োজন।

আজ আমি এখানে কোন গণ-প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হইনি। বিদগ্ধ ধরণীর একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে উপস্থিত হয়েছি। এই মহান উক্তির মাধ্যমে তিনি নিজেকে নত করেছেন। আপন উদারতাকে প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, আমার একান্ত প্রত্যাশা বিশ্বের সকল সমাজে শান্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। শোষন-নির্যাতন নির্মূল হয়ে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। বিগত কয়েক যুগ ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জাতি সংঘের মাধ্যমে নানাবিধ বিশ্ব সমস্যার সমাধানে প্রয়াস চালিয়ে আসছে। যেমন ঃ স্থলে মাইন স্থাপন উচ্ছেদ, রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ, পারমানবিক যুদ্ধের অবসান, তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ, শিশু হত্যা রোধ ও আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠাকরণ। এই আদালতের মাধ্যমে যুদ্ধ অপরাধী ও গণহত্যার বিচার নিস্পত্তি করা যেতে পারে।

কোন জাতির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের পূর্বে বারবার ভেবে দেখতে হবে উক্ত অবরোধের মধ্যে অন্যায় কিছু আছে কিনা। কারণ একজন ব্যক্তি কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ করা হলে উহা যদি গোটা জাতি তথা আবালবৃদ্ধবনিতার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় তবে উহা সত্যিই অমানবিক।

একটা জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির যুদ্ধ ঘোষণা কখনো প্রয়োজন হতে পারে - তবে যুদ্ধ কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। উহা সর্বদাই একটি অন্যায় ও মানবতা গর্হিত কাজ।

বিশ্বের শক্তিমান জাতি গুলো " আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ নীতি" গ্রহণ করে বিশ্বের বুকে বিশেষ উদাহরণ স্থাপন করতে পারে।

উপসংহারে তিনি বলেন,

ঈশ্বর আমাদের সকলকে ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি দিয়েছেন। আমরা সম্মিলিতভাবে বিশ্ব মানবতার হয়রানির অবসান করতে পারি। আমরা বিশ্বশান্তি গড়ার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারি। আমরাই বয়ে আনতে পারি বিশ্বশান্তি । যে শান্তি লালনে ও পালনে হয় সুসংহত।

Source : The New York Times
Dec 10,2003

The Changing Face of the PBCA Cabinet

- Samuel C. Quiah, Kew Garden, NY

The Probhashi Bengali Christian Association (PBCA) has offered its members, for years, a space where community members of a common faith and culture could gather together to practice, conserve and pass on their traditions. The Association provides a wide range of events in which, members can participate, from cultural event planning, picnics, to Christian and Catholic services, recreational activities, and trips. While the vast majority of PBCA events have always included a youth component, it was not until recently that Probhashi sought the input of young people in planning its programs.

In years past, a young person, who grew up in the United States, would shy away from any serious involvement in the PBCA, citing that they did not desire to be in the company of conservative "aunties and uncles." Participating for young people meant just showing up to an event, saying hello to relatives, and occasionally dancing in one of our cultural programs. This level of participation was accepted as the norm by the majority of our community's elders and adults, as most of our youth during the beginnings of PBCA, were young adolescents and teens. However, as our young community members gradually moved on to college and professional careers, it became more apparent that PBCA efforts to engage young adults, to assume community leadership positions was severely lacking. This, however, would soon change.

Being a child of immigrants, and an immigrant myself, I was well aware of the struggles and hurdles my parents had to persevere through, to acclimate to their newly adopted home. All immigrant families, to some extent, go through financial hardships. It is inevitable that immigrant families, through trial and error, will experiment with different jobs, homes, and varying methods of raising their children and preserving their culture. While most of our community members have successfully obtained jobs, it is the system by which, we preserve of culture, that has become an increasing point of contention between young Bengalis and their parents.

So what is the PBCA to do when the young generation has increasingly felt alienated from their cultural conduit? It is a question that was taken quite seriously by PBCA cabinets of the past two years. New Probhashi presidents, Simon Gomes and Joseph D'Costa thought very hard about a new direction, a new vision, one that would put PBCA on track to meet the needs of a younger generation. So what course of action was taken?

Putting it quite simply, they asked young people like me to come aboard and help. More importantly, they ensured me that my voice, my opinion, as a young person mattered, and was needed for the healthy functioning of our Association. Not only did they reach out to me, but several other young Bengalis in their late teens and twenties. No longer are young people just being asked to be a spectacle for viewing in a show, or to be an MC at a holiday party, only to disappear till the next big showcase. Now, young cabinet members are overseeing the planning, budgeting, public relations, recreational, and advancement aspects of PBCA functioning.

This was my first year as an elected member of the PBCA cabinet. I, like many of my young peers would, pondered whether or not the Probhashi space would be for me. I thought, what if my voice gets drowned in a sea of elders, and my participation is seen as irrelevant? Yet, as I attended my first few meetings I very quickly discovered the very warm, caring nature of the cabinet members and their willingness to listen. Not only did I develop working relationships with my fellow cabinet members, but great friendships. The cabinet always work in teams, and looks out for one another, but most importantly, we are always seeking for innovative ways to help advance our community. By no means is PBCA a utopia, but all the tools and support systems are there for a young person to thrive and develop into a bonafide community leader.

I have come to think of myself as a progressive, or radical thinker. Never was I much for small talk and gossip, therefore, I presumed I would never fit into the mix at PBCA.

But, to my own surprise, I have been even more impressed by how the new faces of PBCA have put personal differences aside, and have focused on the common goal of community development. We realize this happens in so many ways that I can honestly say if a young person has a new idea for PBCA to explore, we are more than willing to see if it is a possibility. I highly encourage teenagers and college students to volunteer for some events, or get involved in the planning process, in whatever small way you can contribute. As the cabinet gets younger, our agenda becomes more progressive and representative of the community we serve. So, the future of our community lies in its youth.

We as Bengali Christians, seemingly always find ourselves in a crisis of identity. We are, by national origin, from a country where we are seen as a minority, and marginalized from reaching our full potential. Conversly, in the United States we are part of a religious Christian majority, but find ourselves again as the minority, being brown skinned peoples. Furthermore, when we look to our Pakistani, and Indian brothers and sisters, for community, we are commonly misunderstood as those who have "sold out" to western imperialists. Finding pride in your cultural identity does not have through the acceptance of others. It can come from within our community, and your willingness to make it the best space possible. We at the cabinet look forward to meeting new faces everyday, so please feel free to send us an e-mail, visit our website, or call us. We are here as resource for you, and you for us. May the holiday season bring blessings to you all.

অথচ পবিত্র

- সুশীল জন গোমেজ, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া।

চীনা শুকানির বাঁক ঘেঁষে ঘেঁষে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে ইছামতি নদী। তারই তীরে লতাপাতায়, সবুজে শ্যামলে ঘেরা ছোট্র একটি গ্রাম "সেনপুকুর"। সিকিম আরি মন্ডল এ-গ্রামের ডাকসাঁইটে প্রভাবশালী মোড়ল। যাঁর হাঁকডাকে মেম্বার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে থানার দারোগা পর্যন্ত কাঁপে। বাঘে - মোষে এক ঘাটে জল খায়। গ্রামের সবাই তার আজ্ঞাবহ। এমন কোনো লোক নেই এ - এলাকায়, মন্ডল বাড়ির নাম শোনেনি। দেশ বিভাগের পূর্বে এটাই ছিল ঘোষাল বাড়ি। গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৈবর্ত, কৃষিজীবী, ও ছোটখাটো ব্যবসায়ী। উত্তর পাড়ায় ফালু মিঞার বাড়ি। সে একজন দিনমজুর। রোজ এসে রোজ খায়। তবে শক্তসামর্থ এক নৌজোয়ান। বাড়িতে বৃদ্ধা মাতা ও নতুন বউ। দৈন্যের মধ্য দিয়েও হাসিখুশিতে ভরা সুন্দর একটা সংসার। বিধবা মাই এসংসার তরণীর কর্ণধার। আঠারো গ্রামের এক গ্রাম, শোলপুর - এর আর পি গোমেজের সাথে তার খুবই ভাব। দু'জনেই ভালো ফুটবল খেলত। গোমেজ সাহেব ঢাকায় একটা ব্যাংকে চাকরি করেন। দু'জনের পথ ভিন্ন দিকে বাঁক নিলেও তাদের বন্ধুত্বের ভাটা পড়েনি।

ফালুর বউ তসিমন একদিন মাথা ঘুরে পড়ে যায়, উল্টে উঠে, বমি করে। শাশুড়ি তার মাথায় পানি দেয়। তার মুখে ফুটে ওঠে তৃপ্তির হাসি। এতদিনে আল-াহ্ তার আর্জি মঞ্জুর করেছেন ভেবে। তসিমন রাতে তার খসম - কে সব বলে। ফালু মিঞা তসিমনকে পাঁজাকোলে করে খুশিতে নাচতে থাকে। একদিন, দু'দিন করে সময় দৌড়াতে থাকে। ফালু ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করতে থাকে। বন্ধু গোমেজ সাহেবের সুপরামর্শে ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্টও খুলে। যে আসছে সে তো আর যে-সে লোক নয়। তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, সে অনেক বড় হবে, কেউ যেন বলতে না পারে কামলার ছেলে, কামলার মেয়ে। সংসারে তিনটা প্রাণীর মুখেই শরতের পুর্ণ শশীর আলো ঝিলমিল করতে থাকে।

শুক্র পক্ষের শেষ দিন। আকাশ নিকষ অন্ধকার। আতুঁড় ঘরে তসিমনের একএকটি চিৎকার, মেঘনাদের শব্দভেদী বানের মতো, ফালু মিঞার বক্ষ বিদীর্ণ করে শাঁই শাঁই করে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। এ-এলাকার অভিজ্ঞ ধাইমা, মনোমোহন কৈবর্তের বউ, লক্ষী, দু'ঘন্টা ধরে চেষ্টার এতটুকু কার্পণ্য করেনি। তবুও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ঘামে তার সারা শরীর, কাপড়চোপড় ভিজে গেছে। পঞ্চ - পত্র - ধৌত শুদ্ধিজল পান করানো হচ্ছে। চন্ডী, মনসা, দুর্গা কারও নামই বাদ পরছে না। সবাইকেই ডাকা হচ্ছে। এদিকে ফালুর মা, আত্মীয়স্বজন সবাইই আল-াহ্বিল-াহ্ করছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তসিমনের প্রতিটি চিৎকার, ফজরের আজানের ধ্বনি, মন্দিরের কাঁসর ঘন্টাধ্বনি একত্র মিলিত হয়ে ফালুর মনে ধাক্কা দিয়ে, আকাশের মেঘগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটা গোঙানি, একটা চিৎকার। তসিমনের জানটা কবচ করে বেড়িয়ে এলো একটা রক্তমাংসের দলা। তার কান্নার সুর তসিমনের চিৎকারের সাথে মিলে খোদার আরশে গিয়ে ধাক্কা দিল। লক্ষী একটা তেনায় পেচিঁয়ে, তসিমনের সাধের প্রসূনকের দাদির কোলে তুলে দিল। দাদি তার কলিজার ধন "কলজি" কে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। ফালু মিঞা নিথর, চার্চিলের লৌহমুর্তির মতো দ্বারে দন্ডায়মান।

কলজি আস্তে আস্তে বেড়ে উঠে। হাত - পা উপরে তুলে খেলা করে, মুখ দিয়ে নানা রুপ শব্দ বের করে, কার যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। ফালু মিঞার প্রাণটা অপত্য স্নেহে বিগলিত হতে থাকে। সে করসুত্রধৃত পুত্তলিকার মতো, মোহগ্রস্তের মতো মনের অজান্তে দরজা গলিয়ে ঘরে প্রবেশ করে, কলজির মুখোমুখি দাঁড়ায়। কলজি পিতার মুখের উপর স্থিরদৃষ্টে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। অতি আদরের বস্তুটিকে কাছে টানতে চায়। ফালুর সংবিৎ ফিরে আসে। মেয়ের মুখ দেখে ঘেন্নায় তার হৃদয় বিষিয়ে উঠে। একটা অজানা সন্দেহ তাকে ধাক্কা দিতে থাকে, থাপ্পড় দিতে থাকে। অস্ফুট স্বরে তার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসে তিনটা হরফের একটা শক্ত শব্দ, রা - ক্ষু - সী। ফালু ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়, কলজি কাঁদতে শুরু করে। ফালু থমকে দাঁড়ায়। দু'হাতে কান চেপে ধরে দৌড়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়। কলজির কান্নার স্বর কোমল থেকে কড়িতে চড়ে। দাদি তাকে বুকে জড়িয়ে নেয়, তার কুঞ্চিত দুধের বাঁট কলজির মুখে পুরে দেয়। কিন্তু কান্না থামে না। কাঁদতে কাঁদতে অবসন্ন হয়ে সে ঘুমিয়ে পরে। দাদি কলজির পায়ের বাঁকা আঙ্গুলগুলি দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে সোজা করতে চায়, ঘাড়ের কালো দাগটাকে মুখের থুথু দিয়ে ঘষে তুলে দিতে চায়। কী যেন একটি অশনিসঙ্কেত সে দেখতে পায়।

কলজির এখন চার বছর। পিতার সাথে তার সখ্য গড়ে উঠেছে ভাল। ফালু মিঞা কুমোরগঞ্জ হাট থেকে কলজির জন্য আদর্শ লিপি, অ-আ-ক-খর বই কিনে এনেছে। নিজেই মেয়েকে অ-আ-ক-খ শেখায়। নতুন নতুন কুর্তা-পাঁতলুন এনে দেয়। কন্যা আর পিতা এখন হরিহর-আত্মা। এদিকে দাদিও কলজিকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। এক ওক্ত না দেখলে সে পাগল হয়ে যায়। এদিকে ফালুর বন্ধুবান্ধব, এমনকি তার সবচাইতে অন্তরের বন্ধু গোমেজ সাহেবও তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য তাগিদ দেয়। যাতে ফালু মিঞার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সৎ মা ঘরে আনলে তার কলজির কষ্ট হবে। যা সে কোনো দিন সইতে পারবে না।

বসন্তের সমীরণ, নতুন পত্রপল-বে দোলা দিয়ে শিহরন সৃষ্টি করে তুলে, যার হিলে-াল ফালুর হৃদয়ের মধ্যখানটা ছুঁয়ে যায়। কোকিলের কুহুতানে তার পরানটা আজ পাগলপারা। নাভির ভিতর কী যেন বার বার মোচড় খেয়ে যায়। সারা শরীরে তার রোমাঞ্চ লাগে। ওষ্ঠাধারে ফুটে উঠে প্রচ্ছন্ন হাসির রেখা। তার অন্তরের বিষবৃক্ষ আজ ছুটি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে বুহ দূরে, মন্ডলদের পুকুর পেরিয়ে, ইছামতির ওপারে। সে আজ আর মাটি কাটতে যাবে না, কামলা খাটতে যাবে না, পৈরাত দিতে যাবে না, আজ শুধু গান গাবে, গান। ফালু মন্ডলদের পুকুর চালায় গিয়ে বসে, গুনগুনিয়ে গান ধরে, "আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই গেলারে।" এসময়টা প্রতিদিনই কিসের টানে যেন ফালু মিঞা পুকুর-চালায় এসে বসে। কাম-কাইজ তার একদম ভালো লাগে না। কালা মিঞার বিধবা বউ, ফরিদা ভাবি, রোজই এসময় ঘড়া নিয়ে আসে পুকুর ঘাটে ঘড়া ভরাতে। তার মতো সুন্দরী বধূ এ-গ্রামে দ্বিতীয়টি নেই। গরীব না হলে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারত। বৈধব্য যন্ত্রণাও তার মুখের হাসিটুকু কেড়ে নিতে পারেনি। কলসি কাঁধে ফরিদা ভাবি যখন দুলকি চালে যায়, তার শরীরের প্রতিটা ভাঁজ বসন্তমলয়ের মতো নাচতে থাকে।

ফালু আর ফরিদা ভাবি চোখে চোখে কথা কয়, কিন্তু মুখ ফোটে না। দু'জনই দু'জনকে একনজর দেখার জন্য নানারুপ ফন্দিফিকির করে, ফোকড় খোঁজে। সামান্য দর্শনেই বুকটা ঠান্ডা হয়ে যায়, খালি বুকটা আনন্দে ভরে উঠে। আজও ভাবি পুকুর ঘাটে এসে উপস্থিত। ফালু না দেখার ভান করে মুখ ফিরিয়ে রাখে। ফরিদা কলসি দিয়ে পানিতে ঢেউ তোলে, শব্দ করে। ফালু মিঞা চুপিসারে দেখে নিয়ে দুষ্ট হাসি হাসে। ফরিদা পুকুর পাড়ে কাঁকড়ার তোলা মাটি হাতে নিয়ে জোরে জোরে পানিতে ছুঁড়ে শব্দ করে, সুর তোলে। সে-সুর ফালুর প্রতিটি ধমনিতে গিয়ে বাজে। কিন্তু ফালু কোনো সাড়া দেয় না। ফরিদা তখন ষোল চোঙার তৃতীয় চোঙা প্রয়োগ করে। ইচ্ছা করেই ভরা কলসটা পানিতে ডুবিয়ে দেয় আর ফালুকে ডাকে কলসটা তুলে দেয়ার জন্য। ফালু এক'পা দু'পা করে এগুতে থাকে, ফরিদার বুকের ভিতরও টিপ টিপ টিপ টিপ করতে থাকে। নাড়ির গতি দ্রুত লয়ে চলতে শুরু করে। রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে রাঙা মুখটা আর রাঙা হয়ে ওঠে। সে এক অপরুপ রুপ।

"তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।"

ফালু মিঞা লুঙ্গিটা কাছা দিয়ে বাঁধে। ফরিদা তার বলিষ্ঠ উরুর দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে।

পশ্চিমাকাশে বাসন্তী রঙের আভা। সারা গ্রামের ঝোপেঝাড়ে, লতায়পাতায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, আগুন ধরিয়েছে ফরিদার তনুমনঃপ্রাণে। যার জ্বালায় ফরিদা গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করতে থাকে। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে এশার আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। ফালু মিঞা কলজিকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ায়। রাতে ফালুর চোখে ঘুম আসে না। নানা কথা মৌমাছির ঝাঁকের মতো ভনভন করে তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করে। মনের দুয়ারে ভেসে ওঠে তসিমনের করুণ মুখ। ফরিদা ভাবির বিদ্যুৎ চমক। তসিমনের শেষ কথাগুলি, "আমার পেটে যেটা আছে সেটা যে-সে না! সেইটা ফালু মিঞা না, তসিমন না! অনেক বড় হইব, অনেক!" কথাগুলি মিলিয়ে না যেতেই মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে ওঠে কালু মিঞার খুন হওয়া, ফরিদার আহাজারি। মসজিদের দান বাকশের মালিকানা নিয়ে দাঙ্গা বাঁধল পূর্ব ডাঙ্গার সিকিম আলি মন্ডলের সাথে পশ্চিম ডাঙ্গার শেখ কাসেম ওরফে মিঞা সাহেবের সাথে।" মন্ডলের লাইঠালের বাড়িতে তিনটা লাশ পইড়া গেল। রাতারাতি লাশগুলি গুম হইয়া গেল। একটাও সাক্ষী পাওয়া গেল না। দু'একজন যারা প্রতিবাদ করল, পুলিশের হান্টারের গুঁতায় সব ঠান্ডা হইয়া গেল। মন্ডলের পোষা কুত্তার বাচ্চারা মন্ডলের গলায় ফুলের মালা দিয়া জিন্দাবাদের ফোয়ারা ছড়াইয়া দিল। দারোগা সাব ভাষণে কইল, মন্ডলসাহেবের মতো ধার্মিক, পরোপকারী, সৎ মানুষের অভাব। ধর্মকর্মে তার জুড়ি নাই। তাঁর মতো দান-খয়রাত কয়টা লোকে করতে পারে? আমরা যেখানে যাই, মন্ডল সাহেবের জয়জয়কার শুনতে পাই। গেল মাসে তিনি মসজিদের জন্য গালিচা, অজুর পানির জন্য টিউব ওয়েল, আর মসজিদটাও রং

কইরা দিলেন। তবু মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ছিঃ! ঘেন্নায় আমার গা-ঘিনঘিন করে ওঠে। তাই আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই মিলে মন্ডল সাহেবের হাতকে মজবুত করে তুলুন। অমনি মন্ডলের কুত্তার ছাওগুলি কুঁইকুঁই কইরা উইঠা জিন্দাবাদের তুবড়ি উড়ায়!" এবস ভাবতে ভাবতে কখন যে ফালু নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে কে জানে।

ফালু মিঞার সাথে গোমেজ সাহেবের বাজারে দেখা। তিনি ঢাকা থেকে কলজির জন্য একটা সুন্দর ছবির বই এনেছেন। বইটা ফালুর হাতে দিয়ে বললেন, " কলজি কিন্তু যে - সে মেয়ে না, অনেক বড় হবে ও, দেখো অনেক। কথাগুলি ফালুর হৃদয়ে ধাক্কা দিয়ে হৃদযন্ত্রের তার গুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। কথাগুলি এর পূর্বেই একজন তাকে বলেছিল।

সুরুজ তখন মাথার উপর খাঁখাঁ করছে। ছবির বইটা পেয়ে কলজি মহা খুশি। বারবার আরবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। কখনও সিধে দিক থেকে, কখনও উল্টো দিক থেকে। যতই দেখে আরও দেখতে ইচ্ছে করে।

কিছুতেই মন ভরে না তার। তবে একটা ছবিই তার কাছে ভালো লেগেছে, জুতসই, "রাজ গোখরা।" কলজি বইটা নিয়ে বাবার কাছে গিয়ে বসল। ছবিটার বিষয়ে সে কিছু তথ্য জানতে চাইল। ফালু বলল, "এটা সাপ, কালকেউটা।" কলজি শুধাল, "কালকেউটা কী করে?" ফালু বলে, "কামড় দেয়, ওর দাঁতে বিষ আছে।" কলজি, "বিষ দিয়ে কী হয়?" ফালু, "বিষ ঢাইলা দিলে মানুষ মইরা যায়।" কলজি, "তবে তোমারে বিষ ঢালবে, তুমি মইরা যাবে।" বলেই কলজি খিলখিল হাসতে থাকে। হাসির শব্দে ফালুর বুকে শেল বিঁধতে থাকে। তার হৃদয়টা ছাঁত করে ওঠে, এক অজানা আতঙ্কে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। ফালুর ভাঙ্গা বুকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল ফরিদার কথা মনে করে। চালের বাতা থেকে কাস্তেটা হাতে নিয়ে, এক'পা দু'পা করে ফরিদা ভাবির বাড়িতে গিয়ে সে ওঠে। ফরিদা ফালুকে তাদের বাড়িতে দেখে খুশিতে হাসতে হাসতে তার কাছে এসে বলল, "বাহ্‌ বাহ্‌! গরিবের বাড়ি রাজপুত্রের পা! কী মনে করে, মিঞা ভাই? ঐ এঁড়ে বাছুরটার জন্যে কিছু লতাপাতার দরকার? তা, না ক'য়ে নেই কী করে? তা নিয়েন। একটু বসেন। একটা পান খান।" "পান খাইয়ে যদি আনন্দ পাও, আমার আপিত্তি নাই।" ফরিদা পান সাজে, তার আঙ্গুলের প্যাঁচগুলি ফালুর বুকে নকশিকাঁথার ফোঁড় এঁকে এঁকে যায়। পানের খিলিটা হাতে নিয়ে ফালু ফরিদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। দুজোড়া চোখ যেন এক হয়ে নিজেদের মধ্যে মিলিয়ে যেতে চায়। ফরিদা একটা পানের বোঁটায় চুন লাগিয়ে বলে, "মিঞা ভাই, চুন।" ফালুর চমক ভাঙ্গে ফরিদার কথায়। দু'জনেই খিলখিল হেসে ওঠে। ফালু কাস্তে হাতে দাওয়ায় নামে। পা দু'টো নিথর, পাথর। ফরিদার আকর্ষণ পিছু টানে।

তখনো কিছুটা বেলা আছে। ফালু ফরিদাদের পিছনের বাঁশঝাড়ে গিয়ে লতা ধরে টান দেয়, আর একটা চিৎকার খাইল খাইল, আমারে কালকেউটায় খাইল। হাতের কব্জি ধরে দৌড়ে আসে ফরিদাদের উঠোনে। বসে পড়ে সে কাতরাতে থাকে। ফরিদা তার শাড়ির পাড় ছিঁড়ে বাঁধ দেয় কনুইয়ে, বাহুতে। বাঁধের মধ্যে আউলা নড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে প্যাঁচ দেয়। পাগলের মতো ছুটাছুটি, চিল-চিলি- করতে থাকে ফরিদা। পাড়ার লোক জড়ো হয়, ছেলেরা সাইকেলে করে দূরদূরান্ত থেকে বড় বড় ডাকসাঁইটে ওঝা বৈদ্য নিয়ে আসে। কেউ মনসার দিব্যি দেয়, কেউ দেয় শিবের। কেউ দেয় পিরের দোহাই, কেউ দেয় চন্ডীর। কেউ দেয় পাথর চালান, কেউ দেয় হাত চালান। ফরিদা তুলারাশি বলে ফরিদার হাত চালান দেয়। ফরিদার হাত এঁকে বেঁকে সাপের মতো বেয়ে বেয়ে ফালুর ব্রহ্মতালুতে স্থিত হয়। রক্তের চাপে ফরিদার হাত ছিঁড়ে যেতে চায়। সে ব্যাথায় ককিয়ে ওঠে। ওঝা এসে ফরিদার হাত ফালুর মাথা থেকে নামিয়ে দেয়। ফালুর মাথাটা ফরিদার বুক ঘেঁষে কোলের উপর ঢলে পরে। ফরিদার উষ্ণ অশ্রু ফালুর বুক মুখ সিক্ত করে দেয়। ফালুর মা বুক চাপড়িয়ে কলজিকে বরে, "রাক্ষুসী আমার পুলাডারেও খাইলি।" মাস দুই যেতে না যেতেই দৈন্যের ছোবলে বিষাক্ত হয় প্রয়াত ফালু মিঞার সংসার। ছেলের মৃত্যুতে ফালুর মা দশ বছর বুড়িয়ে গেল। জঠরের জ্বালা। একটা ভাঙ্গা থালা নিয়ে ফালুর মা রাস্তায় নেমে পড়ল।

কলজি এখন ১০ পেড়িয়ে ১১ তে পা রেখেছে। দাদিও জীর্ণ - শীর্ণ, জড়াগ্রস্ত। সব পথই ওদের জন্য বন্ধ হ'য়ে গেছে। শুধু একটা পথ খোলা। বুড়ি তাই লালসার সোপান বেয়ে উপরে ওঠার আশায় কলজির হাত ধরে মন্ডল বাড়ি গিয়ে উঠল। মন্ডলের শ্যেনচক্ষুর রঞ্জনরশ্মি কলজির বুক, মুখ, ঠোঁট এবং আরোও কিছু মুহূর্তে এক্স-রে করে নিল। পাখির মতো পাখ বাড়িয়ে কলজিকে মন্ডল বুকে সাপটে নিল। দাদিকে অভয়বাণী শুনিয়ে কলজিকে আদর করল। কলজি মন্ডল বাড়িতে ফাঁইফরমাশ খাটে, ব্যাজনের বাতাসে দুপুরের তপ্তদাহ হতে মন্ডলের শরীর শীতল করে। মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত মর্দন ও আঙ্গুল চালিয়ে মন্ডলের শরীরের ভাঁজে - ভাঁজে সুড়সুড়ি দিয়ে তার তপ্ত হৃদয়ে রু-আফ-জার ধারা বহিয়ে দেয়।

সন্ধ্যার পূর্বেই কলজি দাদির সাথে বাসায় ফিরে। আজ দিনটা বড়ই গোমট। কাঁঠাল-পাকা গরম। দুপুরে খাবার পরই গা'টা নেতিয়ে পড়তে চায়। মন্ডলের বুড়ো ভৃত্য নৈমুদ্দি শেখ আমবাগানে আম গাছের ছায়ায় ঘুমায়। মন্ডল খালি গায়ে শীতল পাটিতে হাত - পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। কলজি মন্ডলের পাশে তন্দ্রার কোলে ঢলে পড়ে। ব্যাজন আর হাওয়া দিচ্ছে না। মন্ডলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। মাথা তুলে সে আর একবার কলজিকে এক্স-রে করে। দীর্ঘনিঃশ্বাসে কলজির বুকটা ওঠানামা করছে, মন্ডলের ভিতরের ইবলিসটা নড়াচড়া দিয়ে উঠছে। কুমোর তার সদ্য - গড়া প্রতিমাটি শুকিয়ে শক্ত হবার আগেই হাঁটু চেপে বসে পড়ল। মুর্তিটা ফেটে খানখান হয়ে গেল। ফালু মিঞার আঙিনার জবার কুঁড়ি দু'টি পাপড়ি মেলার পূর্বেই ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝরে গেল। দাদি বিকেলে মন্ডল বাড়ি গিয়ে কলজিকে না পেয়ে ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে, রাগে গজগজ করতে লাগল। তার জীর্ণশীর্ণ পা দু'টিতে শক্তি ফিরে এলো। দৌড়ে দৌড়ে এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে করে সারা গ্রাম চষে ফেলল। কিন্তু কলজিকে কোথাও না পেয়ে, একরাশ হতাশা বুকে নিয়ে, স্থবিরের মত বুড়ি বাড়ি ফিরে এলো। ডেরাটার কোণে চোখ পড়তেই সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে, মুখে যা এলো, তার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে ফেলল। কলজি নিথর, চোখ দু'টি স্থির, দৃষ্টি নিস্প্রভ, মুখে তার রক্ত নেই, হাতে পায়ে শক্তি নেই, নেই চলার গতি। ব্যাধের শরে আহত, ডানাভাঙ্গা পাখির মতো পড়ে আছে কলজি। দাদির মনে সন্দেহ, শিবলিঙ্গের মতো শক্ত হয়ে উঠল। ব্যাকুল হৃদয়ে কলজিকে হাত ধরে দাঁড় করালো। কলজির নিম্নাঙ্গের শোণিত ধারায় শাড়িটা ভিজে লাল হয়ে গিয়েছে। দাদি তার কলিজার ধন কলজিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। বুক চাপড়িয়ে বলল, " এই সর্বনাশ তার কে করল? দাদির কান্নার রোল আকাশে বাতাসে শাঁই শাঁই মিলিয়ে গেল।

সারারাত দাদি ঘুমাতে পারল না। কলজিও না। মাঝে মাঝে কচি কলাপাতার মতো কলজির গা কেঁপে কেঁপে উঠল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কলজি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দাদি দু'হাত উপরে তুলে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, থানা দারোগা যার হাতে, মেম্বার-চেয়ারম্যান যার হাতে, যার এত লাইঠাল, যার এত পরতাপ, তার বিচার কে করব? গেল বছরের আগের বছর কার্তিকার বউডার সর্বনাশ করল, কার্তিকার মাথায় খুন চইড়া গেল, আউলা নড়িটা হাতে লইয়া কার্তিকা ছুইট্যা গেল মোড়ল বাড়ি, আর ফিরা আইল না। এত পরতাপ যার তার বিচার করব কে? মসজিদের দান বাক্সর দখলি লইয়া দাঙ্গায় ৩টা লাশ ফালাইল। দারোগা-পুলিশ তার কিছুই করল না। চীনা শুকানির সারা বাঁকটা কুমিরের মতো গিলা খাইল। তার পরও মনোমোহন কৈবর্তের এক চিলতে ভিটাটা রক্ষা পাইল না। দিনে দুপুরে মোড়লের লাইঠালরা, বউ-পুলাপানসহ মনোমোহনরে বাড়িথন বাইর কইরা দিল। এত পুন্যি যার তার বিচার কে করব?" দাদি কলজিকে ঘরের বার হতে দেয় না। খাঁচার পাখির মত আঁটকে রাখে। কেননা দাদি জানে, এক কান দু'কান কথা হয় খান খান। তাই তার কলিজার ধন কলজিকে বাড়িতে আড়াল করে রাখে। এদিকে দাদি ভিক্ষায় বেড়িয়ে গেলে, এ-বাড়ির বউ, ও-বাড়ির ঝি আস্তে আস্তে কলজির কাছে আসে, একথা ওকথা বলে বলে তারা আসল কথায় পা দেয়। কলজি মুখ বন্ধ করে রাখে, কারও কোন কথার জবাব দেয় না। সবাই মুখ টিপে হাসে, বিশ্রী বিশ্রী কথা বলে ইঙ্গিত করে। কলজি সব হজম করে।

পৃথিবীতে অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু প্রকৃতির আকৃতিকে ঢেকে রাখা যায় না। কলজি বমি করে, তার মাথা ঘোরে, চুলার পোড়া মাটি খায়, ঝাল-টক খাওয়ার জন্য তার মনটা ছটফট করে। দাদির মনটাও আস্তে আস্তে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে থাকে। উৎকণ্ঠায় ঘুম হয় না। যমের ভয় সে করে না, করে ইজ্জতের ভয়। দিন গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়, রাত হয়, কলজির নাভির নিচটাও ফুলে উঠতে থাকে। সে লজ্জায়, চিন্তায়, ঘেন্নায় কুঁকড়ে ওঠে। অমানিশার ঘোর অন্ধকার, তার চাইতেও অন্ধকার কলজির ভবিষ্যৎ। বাবার কাছ থেকে ঈশা পড়া শিখেছিল কলজি। তাই বিছানার পাশে পশ্চিমে মুখ করে কলজি সেজদা দেয়। দাদির কোটরাগত চোখের মণি দু'টো অন্ধকার ভেদ করে চিকমিকিয়ে ওঠে।

চারদিকে অন্ধকার, মসজিদে মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি, মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা। মন্ডল উঠে অজু করে পাকপবিত্র হয়। ধীরেসুস্তে মসজিদের দিকে পা বাড়ায়। মসজিদের উত্তর কোণের হিজল গাছের ফুলগুলি তখনো স্পষ্ট দেখা যায় না, ফুলগুলির সাথে কী যেন একটা ঝুলে আছে। মোড়ল ঘা খাওয়া কুকুরের মতো আস্তে আস্তে গাছটার গোড়ায় যায়। লাশটার মুখের দিকে তাকিয়ে, তৃপ্তির হাসি হেসে বুকটাকে খোলসা করে, মসজিদের দাওয়ায় বসে পড়ে।

বেলা বাড়ে। মন্ডলের চুনা-লড়ার মিছিলটা মসজিদের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। তার গলায় ফুলের মালা। এদিকে চারপায়ার উপর কলজির লাশটাও একই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলে। তার বুকের উপর ফুলের তোড়া। জিন্দাবাদ ধ্বনি ও কান্নার রোল, এক সাথে মসজিদের কালো পাথরের গায়ে বিঁধে যায়।

সমাপ্ত

BANGLADESH THEN AND BANGLADESH NOW

- Blin Gonsalves, New York

Bangladesh is our homeland, our origin and our identity. A piece of our heart and soul will always be there in our homeland. It is obvious that we always have a curiosity and eagerness to know as to how our family members, close relatives, friends, and community people are doing in Bangladesh. We all like to know as to how the global technological development changing our economic, social system, communication and overall life style in Bangladesh. We now get all news through different News Networks that are available now. However, the high emotions, excitement, pleasure, bond involved in a personal visit to our homeland and the fist hand knowledge that one gets through that visit is incomparable and invaluable. I recently visited Bangladesh after sixteen and a half years. I could not resist my temptation to share my experience with all the readers of this magazine. I guess, we get full value of a joy by sharing that joy with others.

I made a trip to Bangladesh in January 2003 after sixteen and a half years.

During my stay for about two and a half months I visited Dhaka, Chittagong, Cox's bazar, Diang, Chandraghona, Kaptai and Noakhali. I noticed a remarkable difference in Bangladesh from what I saw 16 years ago. Certainly there is progress in many areas but there is also decline in many areas. I will try to highlight the both positive and negative aspects that I have observed.

Positive Development:

Because of technological development and the globalization of technologies, there is certainly more opportunities in Bangladesh now for growth and development for some in Bangladesh. I have noticed that there are many people in Bangladesh leading probably much better life then most of us in the USA. I was amazed to see the fashionable shopping malls, commercial and residential buildings, various restaurants, and the modern markets. There are many prestigious American educational institutions now in Bangladesh.

There are definitely more job and business opportunities available now compared to what I saw sixteen years ago.

I last visited Bangladesh in December1987 during our daughter's wedding. At that time Video cameras, DVDs, other musical equipments and appliances were rare in the market, it was very expensive even then I had to buy one Panasonic Video Camera for my daughter's wedding ceremony which cost me about $ 1400, but now any one can afford to buy a Video Camera. At that time there were no cell phones, but instead there were beepers.

Computers were just a new invention in the market. Sending E-mails were not that common. But gradually the art of communications around the world improved significantly. Now there are Phone Cards, Satellite Dishes, Cell Phones, as if the whole universe has become very close and within everybody's reach. All these technological development is now available in Bangladesh.

Like in this country computer is now gradually becoming affordable for many people in Bangladesh to be a household item like Television, Refrigerator and other household items. Cell phone is now available in remote rural Bangladesh. Due to the improvement of global media networks, satellite and dish communications people in Bangladesh now have access to more international programs. They have more choices of programs to select and watch. As a matter of fact most people now watch more Indian and international programs then our own Bangladeshi programs.

The rail and bus communications between Dhaka and other districts specially
with Chittagong has improved. There are express trains and luxury buses from Dhaka to other districts. As such, the communuting time from Dhaka to other districts have been reduced to a great extent. I heard people from Arikhola, Nagori, Pubail and other areas adjacent to Dhaka now commute daily to and from Dhaka to their work places.

The communication between India and Bangladesh is much closer now.

Therefore, many in Bangladeshi's can afford to go to India for better
treatment. Certainly, many people are benefitting from this closer relationship.

Negative Aspect/Effect

There is certainly some progress but unfortunately this progress is not happening evenly. Specially, the people who have enough income from businesses and other sources are leading a very high level aristocratic and sophisticated life style, living in modern houses with expansive foreign made furniture and latest model cars. Their children are being educated in
American educational institutions whereas majority middle class people are surviving from hand to mouth and the poor are barely surviving. In other words, there is increasing inequalities between rich and poor. The gap between rich and poor are rapidly widening. The rich are getting even richer and the poor getting poorer.

The overall road communication is still needs lot more improvement. The roads, highways and city streets remain to be a major problem. There is lack of proper planning, coordination, and political will to improve this condition. The roads and communication within the Dhaka and major cities still remains to be night mare. Cities like Dhaka and Chittagong are overcrowded. And there is always terrible jams. Trains, buses, rickshaws, baby taxies are overcrowded at all times.

Most of the country's development is still confined in and around Dhaka and other major cities. The Government of Bangladesh has so far been unable to decentralize the developments in rural districts like Noakhali. There are hardly any development activities in Noakhali. There is no employment opportunities in Noakhali. As such, people from Noakhali are rapidly relocating in major cities. Our total local Noakhali Christian population has been reduced dramatically. There are many Christian houses (bari) in

Noakhali either empty or have care takers. Some of the bari's have only one or two old family members. If this downward trend continues I wonder if there will be any Christians left in Noakhali in the foreseeable future.
This is probably true for many other villages.

The global media networks, satellite communications and technological development is influencing/draining our culture, disintegrating our identity and spirit of our culture I have noticed a drastic change in our norms, values and culture. It seems young people are now more westernized as they are getting more exposed to the western culture. This is a significant negative effect of globalization of information. People's life style and way of thinking have changed dramatically. Their attitude, nature, feelings, beliefs, more surprisingly their life style have changed totally. They try to resemble the western culture the beauty of our country is their shyness and simplicity in every respect of life but now that behavior have disappeared there is more openness in every young people that I met. Fellow feeling have totally vanished everybody is busy to achieve monetary gains by any means, good or bad, to show off in the modern society we are now in a complex, competitive and advanced world which drives everybody to become rich and famous in anyway we can. It seemed to me that our traditional family and social values are now being eliminated in the new generation

Human respect is another great quality of every human living beings which has totally changed. The word respect has no meaning in the present society Who has money has respect, regardless of who they are. Seniors have no place in the modern society. The young generations thinks they know more than anybody else, regardless of their educational background, and other worldly experience.

Conclusion

The great accomplishments of this information age, which shortened time, distances and shrank the world, should not determine the guidelines of our civilization or reshape our national culture. We should not loose our identity. We must be able to preserve our culture, our traditions and our values that we are so proud of. This globalization of technology and information must be combined with significant educational, social and economic support for everyone that could make our culture flourish alongside foreign cultures. Everyone should have the opportunity to integrate into this development process and flourish with the rest of the world. So they can enjoy the benefit of this growth. Obviously, with technological development and the world coming closer people's need and want have also increased. It is unfair to increase their appetite and leaving them unequal in their ability to satisfy that appetite. Many millions of people in Bangladesh is yet to benefit from this development. To me HOME is a place where everyone has the equal opportunity to prosper.

Hope you will find it interesting.

Thanking you for your support and help to improving our Bangladesh Christian Community in New York.

In loving memory of my father, Raphael Gomes

(First Probashi Santa Clause)

Elizabeth Hema Gomes, MD, MPH

Like many of us, my parents came to the United States to give their children a better future. By childhood, it was ingrained in me that a better life comes from a good education. This mantra was so deep rooted that I even got away with not doing any household chores as long as I received straight

As I could have never made it this far with out my family's loving support, especially that of my mom and dad. My accomplishments are not merely my own, but more so theirs.

So for all you young kids who are being raised in America, my message is to you. It takes a lot of hard work and dedication to make it here, but all your sweat and tears will definitely be worth it. Don't let money come in your way. I paid for my own education. I worked part-time jobs since I was in high school and I still work now. It is possible; America is the land of opportunity and you must find your own path. No matter what obstacles you face, never give up.

So how does one become a medical doctor in the US? Well, you start off by going to a 4 year college. There you fulfill your premedical requirement: one year of Physics, Biology, Chemistry, Organic Chemistry, Math (usually Calculus), and English. You can major in anything you want; it need not be the sciences. I highly recommend exploring your interests in and outside school. For me, I volunteered at hospitals and mastered BharathaNatyam. Dancing is what kept my sanity throughout the years. Medicine cannot be all that you do. To have a rich life you must have outside interests.

Getting back to being a doctor. While completing undergrad, you take the MCAT (Medical College Admission Test). You, then, apply to medical school. Getting into medical school is very competitive, so expect it. They look at your grades, your MCAT scores, and your extracurricular activities.

During medical school, you spend the first 2 years learning from books. It's like being in college again, but much more vigorous. The next 2 years are your clinical rotations, during which you work in the hospital with real patients. You sample the various fields within medicine like internal medicine, surgery, obstetrics, gynecology, psychiatry, pediatrics, etc. You also take national board exams for medical licensing (USMLE Step 1 and Step 2). At the end of 4 years of medical school and successfully passing your licensing exams, you finally graduate; you are a doctor. This is where I am now.

The next step is residency. During this time you are trained in a particular field: internal medicine, surgery, emergency medicine, etc. This ranges from 3 to 7 or more years depending your specialty.

Yes, it is a long process, however it is worth it. I may be the first in our small community to travel this road, but I pray that many more will follow. We come here to the US leaving family and home behind. These hardships pay off when parents see their children as professionals, be it doctors, lawyers, engineers… We, as a community, must continue to make great strides.

তিন বন্ধুর গল্প এবং আমাদের ভূমিকা

- অপূর্ব জেরাল্ড গমেজ, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া

"Words have the most Hypnotic power in this world"

পৃথিবীতে অন্যতম শক্তিশালী জিনিষ হলো "কথা" (Word)। তুমি ভালভাবে কথা বলে সবকিছু পেতে পার আবার কথার জন্যই সবার কাছে খারাপ হতে পারো। প্রকৃজ পন্ডিতের মতো বলল। আমি বললাম এটা ঠিক না। যদি আমি বলি 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' তাহলে কি আমি ঈশ্বরকে পাবো। আবার যদি আমি বলি 'পাপ' 'পাপ' তাহলে কি আমি শয়তান হয়ে যাবো? প্রকৃজ বলল শোন্ একটা গল্প বলি - "একদিন এক সম্মেলনে এক ব্যক্তি সভাপতিকে বলল, চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা। সভাপতি তার গালিতে এতই হতচকিত হয়ে গেল যে, সে কিছুক্ষণ কিছুই বলতে পারল না - হা করে চেয়ে রইল। তারপর গা ঝেড়ে ঐ ব্যক্তিকে এমন ভাবে বকা ঝকা শুরু করল যে ঐ ব্যক্তির জাতশুদ্ধ উদ্ধার হয়ে গেল। তারপর ঐ ব্যক্তি বিনীত ভাবে বলল, পি-জ আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আমার কথার জন্য সত্যিই অনেক দু:খিত। সে হাত জোড় করে মাফ চাইল। সভাপতি তখনই নরম হয়ে তার সাথে হাত মেলাল। তাহলে দেখ 'কথাই' কি রকম ভাবে সভাপতিকে রাগিয়ে দিল আবার 'কথাই' তাকে শান্ত করল।

আমরা তিনবন্ধু সকাল বেলা আসাদগেট হোষ্টেলের বাইরে দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। আমার নাম সবুজ, ঐ পন্ডিতের নাম প্রকৃজ আর একজন হলো আকাশ। আমরা একই গ্রাম থেকে বড় হয়ে এখন নটরডেম কলেজে পড়ছি। আমাদের মধ্যে প্রকৃজ একটু অন্যরকম, সবসময়ই জ্ঞানীর মত কথা বলে। আমি ওকে খুব হিংসা করি - কারন ওর মত সবকিছু আমি করতে পারি না। আবার ওকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি - আমার সত্যিকারের বন্ধু প্রকৃজ। তাই ওকে ছাড়তেও পারি না। ওর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি - সুন্দর সুন্দর কথা, গল্প, কবিতা। আমাকে জীবনে সুন্দর ভাবে চলতে শিখাচ্ছে প্রকৃজ। তাই ওকে হিংসা করলেও ওকে ছাড়তে পারি না।

প্রকৃজ ভীষন অন্যরকম। সবার থেকে আলাদা। ও যেন ওর এক আলাদা পৃথিবী নিয়ে বাস করে। আমি মাঝে মাঝেই দেখেছি প্রকৃজ একা একা আবৃত্তি করছে - খুব সুন্দর সুন্দর কবিতা। বিশাল বিশাল কবিতা ওর মুখস্থ। জিজ্ঞাসা করলে বলে আবৃত্তি করলে ওর মন ভাল হয়ে যায়। অনেক সময় দেখেছি ও আনমনে চেয়ে আছে আকাশের দিকে - গাছের দিকে। একদিন দেখি গাছের সবুজ পাতা ছিড়ে খাচ্ছে। ওর মতে গাছের মত শক্তিশালী জিনিষ আর নাই। অদ্ভুত ধরনের ছেলে। খাওয়া দাওয়ার পরে চোখে ঠান্ডা পানি দেয়। ওর ঠাকুরদা নাকি বলেছে এতে চোখের জ্যোতি বাড়ে। ওর মা বাবা নেই, বড় একা। খুব লম্বা হয়েছে - কুস্তি ওয়ালাদের মত স্বাস্থ্য - বাঘের মত শক্তি পায়। সকালে উঠে প্রতিদিন ব্যায়াম করে, তারপরে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্যান করে। বিকালে খেলাধূলা করে। সন্ধ্যায় কিছু বন্ধুদের সাথে প্রতিদিন আমাদের পাশের রুমের ফাদার মোহনের সাথে গল্প করে। পৃথিবীর সব নামকরা লেখক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতি, কাব্য উপন্যাস ওদের আলোচনার বস্ত্ত। ফাদার মোহন আমাদের কলেজে ইংলিশ পড়ায়। খুব ভাল লোক। প্রকৃজ সিগারেট - মদ খায় না। সারাদিন সময় পেলেই পড়াশুনা করে - দুনিয়ার যত মজার মজার বই ওর সংগ্রহে আছে। সব মজার মজার কথা ও আলাদা খাতায় নোট করে রাখে। কিছু বললে বলে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর আসবাবপত্র নাকি বই। জীবনে নাকি তিনটি জিনিষ প্রয়োজন - বই, বই এবং বই। বই পড়া নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল অভ্যাস। আমাকে একদিন বলে "জানিস সবুজ, ঘুমের মধ্যে যে হেঁটে বেড়ায়, তাকে বলে সম্নাম্ বুলিষ্ট।" শরৎচন্দ্র চট্টাপধ্যায় নাকি রেঙ্গুন অফিসে কেরানীগিরি করত। নিউটন নাকি ২৩ বছর বয়সে মহাকর্ষ, আইনষ্টাইন ২৬ বছর বয়সে আপেক্ষিক তত্ত্ব, ডারউইন ২৭ -এ বিবর্তনবাদ আর জেমস ওয়াট ২৫ - এ ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিল। এই মজার মজার তথ্য ওর কাছ থেকে পাওয়া যায়। আমার মাঝে মাঝে ওকে পাগল মনে হয়। এই পৃথিবীকে সুন্দর করার দায়িত্ব যেন শুধু ওর একার। এতটুকু বয়সেই পন্ডিত হয়ে গেছে।

আমরা বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ প্রকৃজ উঠে একটি লোককে জিজ্ঞাসা করল "ভাই, আপনি কি পাগল না ভাল?" লোকটি ভীষন রেগে গিয়ে বলল - "এই বদমাস, ফাজলেমি হচ্ছে, না। একটা থাপ্পর দিবো।" আমরা তো হা করে দেখছি ও কি করছে। তারপর একটা পাগলকে দেখে জিজ্ঞাসা করল - "ভাই, আপনি পাগল না ভাল?" পাগল উত্তর দিল - " কেন? আমি ভাল।" বলে অদ্ভুত ভাবে হাসতে থাকল। পাগলের কান্ড দেখে আমাদের হাসতে হাসতে মরার অবস্থা। প্রকৃজ বলল একটু মজা করলাম। আকাশ বলল - "এই আজ সন্ধ্যায় আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়ের পার্টি, যাবি নাকি তোরা?" আমরা সবাই না করলাম। প্রকৃজ বলল - "আকাশ, তুই আজ বিয়ের পার্টিতে যাসনে, গেলে বিপদে পড়বি।" আকাশ বলল কেন যাবো না, তোর যতসব উল্টাপাল্টা কথা।

তারপর আমরা চলে গেলাম হোষ্টেলে। কলেজে যেতে হবে। কলেজ শেষে আমি প্রকৃজকে নিয়ে আমার জ্যাঠার বাসায় গেলাম। আকাশ গেল বিয়ের পার্টিতে। আমরা জ্যাঠাকে নমস্কার দিলাম। আমার জ্যাঠা বিশাল বড়লোক, শিক্ষিত - গাড়ীতে তার চলাফেরা। প্রকৃজ ওদের চিনত্ না। তিনি আমাদের বলতে শুরু করলেন তার খ্যাতি-যশের কথা। বর্তমান দেশের অর্থনীতির কথা, নেশাগ্রস্থ যুব সমাজের অন্ধকার ভবিষ্যৎ এর কথা। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন - বর্তমান সমাজের বেহাল অবস্থা। এই দেশের সমাজের ভবিষ্যৎ যে কি করুন দশা হবে - এই শংকায় তিনি ভীষন চিন্তিত। আবার সে যে সবার থেকে আলাদা - তার ছেলেমেয়েরা যে সবার মধ্যে থেকে বেরিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যবহারে চরিত্রে সবার সেরা এই কথা বলে নিজেকে প্রশংসার দাবীদার করলেন। প্রকৃজ চুপ করে শুনছিল। মাঝে মাঝে দেখলাম ও রাগে গরগর করছে। আমি জানি ও এইসব মানুষদের দেখতে পারে না। ভদ্রতাবশত কিছু বলছে না। আমি ভাবলাম প্রকৃজ কতো সাধারণ। নটরডেমের ফারস্ট বয় - খেলাধুলা - জ্ঞান সবকিছুতে ফারস্ট হওয়া স্বত্ত্বেও সে সবার সাথে মিশে - সবাইকে সাহায্য করে। ফাদার মোহনের সাথে আমার জ্যাঠার তুলনা করলাম। আকাশ আর পাতাল পার্থক্য। একজনের গর্ব টাকা পয়সা, সম্পদ। আরেকজনের একমাত্র নেশা মানুষের সেবা করা।

যাহোক আমি ওকে জ্যাঠার কাছ থেকে সরিয়ে আমার ভাই বোনদের কাছে নিয়ে গেলাম। ওরা গল্প করছে। আমাদের দেখে আমার জ্যাঠাতো বোন মেরিসা বলল - "এই সবুজ, এটা তোর সেই পাগলা বন্ধু না।" আমি বললাম আস্তে বল, শুনলে এখনই চলে যাবে। মেরিসা বলল - " তুই না বলেছিলি তোর বন্ধু হাত দেখতে পারে।" বলনা আমাদের হাতটা দেখতে। আমার এক বান্ধবী এসেছে - ওর হাত দেখে কিছু বলতে বল দেখি। অনেক অনুরোধে প্রকৃজ মেরিসার বান্ধবীর হাত দেখে বলল - " তোমার যার সাথে সম্বন্ধ হয়েছে সে তাড়াতাড়ি মারা যেতে পারে।" আমরা তো আকাশ থেকে পড়লুম। ছাগলে বলে কি? মেয়েটা কে? তাছাড়া ওর সম্বন্ধ হয়েছে কি না? এসব প্রকৃজ জানবে কি করে। উল্টাপাল্টা বললেই হল। মেয়েটা কিছু না বলে হেসে চুপ করে রইল। তারপর মেরিসার হাত দেখে বলল - " কারও উপরে তোমার প্রচন্ড রাগ আছে।" মেরিসা উৎসাহী হয়ে আরও কিছু বলতে বলল। কিন্তু প্রকৃজ বলল আজ আর বলা যাবে না - অন্যদিন। আমরা অন্য ঘরে ভাইদের সাথে গান শুনতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাকে ইশারাতে ডেকে নিয়ে মেরিসা বলল - "এই সবুজ, তোর বন্ধু যা যা বলেছে - সব সত্য। আমার বান্ধবী বলল, এই গত সপ্তাহে ওর সম্বন্ধ হয়েছে এবং ওর জামাই একজন নামকরা সন্ত্রাসী।

আমরা চলে এলাম। পথে আমি প্রকৃজকে জিজ্ঞাসা করলাম - তুই কিভাবে হাত দেখে সব বলে দিলি। প্রকৃজ বলল - ব্যাপারটা খুব সহজ সব মেয়েদেরই কারো না কারো উপরে প্রচন্ড রাগ থাকে। আর ওর বান্ধবীর নাকে নোলক দেখে বুঝলাম মুসলিম, সুন্দরী আর হাতের ভালোবাসা রেখা ভাঙ্গা দেখে বললাম জামাই মারা যাবে। আমরা দুজনেই হাসতে লাগলাম। আমার জ্যাঠার কথা বলতে সে প্রচন্ড রেগে গেল। ও বলল - দেখ এই সব লোকদের আমি প্রচন্ড ঘৃনা করি। এরা শিয়াল পন্ডিতের মতো নিজের ঘরে নিজে রাজা সেজে হুক্কা হুয়া দেয়। তুই বল সে গ্রাম থেকে বড় হয়েছে, গ্রামের ছেলেদের হাত ধরে স্কুলে গিয়েছে - আর এখন সবার কাছ থেকে আলাদা, কারো সাথে মিশে না। সবাইকে নিজের সাথে তুলনা করে অযোগ্য মনে করে। এটা কি ঠিক? তার মত লোকেরা যদি বড় হয়ে, শিক্ষিত হয়ে এই সমাজের সাথে না মেশে, মানুষকে সাহায্য না করে, যুব সমাজকে পরিচালনা না করে তাহলে এই সমাজ ভাল হবে কিভাবে? তুই বল? আমি এদের ঘৃনা করি। বলে প্রকৃজ ঘৃনায় থুতু ফেলল। আমি বললাম - তুই কি করবি। সে বলল আমি প্রচন্ড শিক্ষিত - বড়লোক হয়ে আমার গ্রাম - সমাজকে, আমার যুব সমাজকে স্বপ্নের মতো সুন্দর করে সাজাবো। ফুলের বাগানের মতো গ্রাম হবে - ছেলেমেয়েরা সবাই পড়াশুনা করবে - কেউ বেকার থাকবে না - কেউ নেশা করবে না। হাতে হাত ধরে সবাই বাঁচবে। আমি বললাম দেখা যাবে - তুইও হয়তো আমার জ্যাঠার মত হয়ে যাবি।

হোষ্টেলে ফিরে দেখলাম - আকাশ চিৎ হয়ে শুয়ে

আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে? সে উত্তর দিল - তোর কথা শুনলে ভাল হতো রে প্রকৃজ। পার্টিতে যাওয়ার পরে সবার সাথে গল্প করছি। হঠাৎ পেটের ভিতরে শুনলাম গুরুম গুরুম শব্দ, ভাবলাম সর্বনাশ। কিছুক্ষণ পরে সবার সামনে থেকে দৌড়ে পালিয়ে বাথরুম খুঁজতে লাগলাম। খুঁজে আর পাই না - এদিকে আমার অবস্থা খারাপ। এই বুঝি যায় যায়। উহ: সেকি অবস্থা। সবার সামনে পাচঁ মিনিট পর পর বাথরুমে - মান সম্মান সব গেছে। আমরা হা হা করে হাসতে লাগলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চা খেয়ে প্রকৃজ বলল - চল সবাই মিলে ফাদার মোহনের সাথে দেখা করে আসি। আমরা যেতে চাইলাম না, কিন্তু প্রকৃজ আমাদের জোর করে নিয়ে গেল। এই ব্যক্তিকে সবাই-ই খুব শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। আমরা সবাই তাকে নমস্কার দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ফাদার আমাদের খুব মজার সন্দেশ ও সিংগারা খেতে দিল। আমরা খুব মজা করে খেলাম। তিনি বললেন - দেখো, তোমরা মাত্র জীবন শুরু করেছ। আমার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং জীবনের প্রতি মূহূর্তেই এই কথাগুলো তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। তোমরা যদি সুন্দর ভাবে বড় হও তাহলে এই সমাজ - এই দেশ সুন্দর হবে। তোমরাও আগামী প্রজন্মকে এই সুস্থ্য - সুন্দর পথে বাচঁতে শেখাবে।

দেখো, জীবনে কোটি মানুষের মতো বেঁচে থেকে আর মরে গিয়ে কি লাভ ? তোমাদের কিছু করতে হবে- তোমার নিজের জন্য - তোমার পরিবারের জন্য - এই সমাজ ও দেশের জন্য। জীবনে সময়ের যথার্থ মূল্য দিবে। " Make the best use of time." প্রতি মূহুর্তকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করবে। জানো, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জয়ী যোদ্ধা কে ? যে নিজের বিরুদ্ধে জয়ী হয়। তোমরা নিজেকে জানো -Know thyself . আত্মা নং বিদ্ধি। তোমাদের নিজেদের লোভ - লালসার বিরুদ্ধে জয়ী হতে হবে। সবসময় একটি নির্দিষ্ট রুটিনে - সময়মত নিজেকে গড়ে তুলবে। জীবনে কয়েকটা জিনিষ মৌলিক ভাবে প্রয়োজন - সততা (Honesty),সৃষ্টিশীলতা (Creativity), গতিশীলতা (Dynamism), হা - বোধকতা (Positivity)। নিজেকে সব সময় চাকার মত ঘুরাবে। সারাক্ষণই ভালোকিছু - গঠনমূলক আলোচনা করবে। যা থেকে সবাই উপকৃত হবে।

দেখো, মোমবাতি কেমন নিজেকে পুড়িয়ে চারিদিকে আলো দেয়, সবুজ গাছ শীত বৃষ্টি রোদ সহ্য করে কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমাদের ছায়া ফল ফুল দিচ্ছে। শত কষ্টেও তার কোন অভিযোগ নেই। তোমাদের ও ঐ গাছের - মোমবাতির মত হতে হবে। চারিদিক জ্ঞানের - ভালোবাসার আলোতে আলোকিত করতে হবে। নিজেকে তৈরী করবে যোদ্ধা হিসাবে। সব সময় উচ্চাকাংখা - স্বপ্ন রাখবে। তুমি সফল না হলেও নিজেকে স্বান্তনা দিবে যে তুমি অন্ততঃ চেষ্টা করেছো। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ব্যয়াম করবে এবং অন্ততঃ ১৫ মিনিট করে ধ্যান (Meditation) করবে। মনে রাখবে ধ্যান সুস্থ ও শক্তিশালী জীবনের জন্য খুব প্রয়োজন। তুমি যদি ধ্যান কর তাহলে দেখবে তুমি একটা অদ্ভুত শক্তি পেয়েছো মনের মধ্যে। পৃথিবীর সব মনীষীরাই ধ্যানের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন।

নিজের ভিতরে যদি বিশ্বাস ও শক্তি যোগাতে পারো তবেই তুমি সফল হবে। "Wisdom and enlightment can be learnt, but can't be taught" দার্শনিক Confusicius - বলেছেন - "One person with belief is worth 99 person with only interes" কথাটা সত্য। সব সময় হাসি খুশী থাকবে - জীবনের অমূল্য সম্পদ হলো - হাসতে পারা। যদি সুন্দরভাবে বাঁচতে চাও তাহলে হাসো (Smile)। "A good laugh is like a sunshine in a house." কখনও কোন দুঃশ্চিন্তা করবে না - কারন মনে রাখবে এই পৃথিবীতে তোমাকে মরতে হবে। তুমি কিছুই সাথে নিবে না। সবই আমরা করছি অপরের জন্য - আমাদের ছেলে মেয়ে অথবা অন্য কোন আপন জনের জন্য। "So don't worry, always be happy."

আমরা চলে এলাম। রাতে ঘুমাতে পারলাম না ভালমত। ফাদারের কথাগুলো ভীষন সত্য। আমি কিভাবে বেঁচে আছি ? সত্যিই তো শুধু সময় নষ্ট করছি। ভাবলাম ফাদার মোহনের মতো আমরা সবাই হতে পারলে – পৃথিবীটা কতো সুন্দর হবে। না আমাকে চেষ্টা করতে হবে - নিজেকে বদলাতে হবে। ভাবতে ভাবতে নিজের ভিতরে কেমন শক্তি অনুভব করলাম - গা শির-শিরিয়ে উঠ্‌ল। ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে সবার আগে উঠে হাত মুখ ধুয়ে ছাদে উঠে ব্যায়াম শুরু করলাম - তারপরে ঠান্ডা ভোরের বাতাসে চুপ করে বসে ধ্যান করার চেষ্টা করলাম। খালি গায়ে - ঠান্ডা বাতাস লাগছে। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম সুন্দর এক পৃথিবীর কথা - সবাই হাতে হাত ধরে বাস করছে - কোন হিংসা নেই - বেকার নেই - শুধু ভালবাসা - চারিদিকে শুধুই - আনন্দ আর হাসাহাসি। খুব ভাল লাগল সত্যিই দারুন এক অনুভূতি পেলাম। চোখ মেলে দেখলাম - প্রকৃজ ও আকাশ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

The Truth About Ms. Virginia

- Mekrina Costa, Laurel, Maryland

I am 12 years old. My name is Eliza. This is my report about my neighbor who is 72 years old. You see I hear she solved a big crime and all sorts of things about her. So, I have decided to interview her and find out the truth.

It is now 10:04 a.m. (6-7-2064). She welcomes me in and I cut to the important facts. I asked her about all the rumors (was it all true?) She looked at me with her dark, mysterious eyes and asked, "Do you know my name, young lady?" I replied, "Ms. Dais, right?" She said, "Yes, but you may call me Virginia."

So she began her story as such. . . "Parts of the rumors are true. It was back at the year 2000 or 2001 to tell the truth. I met this girl names Augustina Reyes. Yes, I remember.. . first time I spoke to her, I asked her for her schedule, and the next thing I know we start being the best of friends.

She and I use to have the deepest and most unusual conversations. While most of our female peers had conversations about their hair, make up, and boys, we had conversations about life, death, the supernatural and such.

When that first year past and the next year came we changed a lot. I mean things and situations changed a lot, you know what I'm saying? But see the way things changed were a little odd. You see everything went wrong and Augustina and I struggled a lot, but one thing that was very astonishing was how our friendship was getting stronger every second. We reached a point where the mere thought of us never seeing each other would shred us apart inside. We were like sister. I remember when people use to even confuse us because we spend so much time together. So, you see how much we meant to each other.

One day we were talking and she said, "Just incase we don't end up in the same high school next year of if we never see each other again, let us promise to at least try and stay in touch." I suggested that she not worry about that because I will always keep in touch with her. In the mist of our conversation Brandon came along and gave us a strange, vexed look and said, "Hi."

(I, Eliza interrupted, "Who is Brandon., Ms.Virginia?")

Virginia continued, "Oh! Brandon was Augustina's childhood friend." They had known each other their whole lives while I knew her for only about two years, yet Brandon was never as close to Augustina as I was.

Anyhow, the next year we luckily managed to go the same high schooL High school was very different for us compared to middle school. For one, we had more freedom in high school. As I remember, one day we saw a movie in class, it was about how to give messages or something. I don't remember clearly about the movie but I do remember the idea it gave me. I went to Augustina and I told her that if we were ever in danger and were killed to pull out our friendship necklace and hold it in our hand as tight as possible. I know it sounds incredibly weird and silly but the again. Augustina and I were weird.

After high school we were looking for colleges, when one day Augustina got a letter that said she inherited some money and a house, which had a nice oceanfront We were both so happy but the problem was that it was very far away. Augustina didn't want to go alone and I didn't want to go at all. I was very ambitious and I knew where I wanted to be in life. I wanted to attend college and have a career. Augustina, on the other hand didn't have a clue to what she wanted. She told me that this was a chance of a lifetime for her, but she wasn't sure if she wanted to take it. Although, soon she was going to blear of what she wanted to do, thanks to Brandon.

You see, as soon as Brandon heard about all this he was more excited then any one of us. He insisted; no he demanded that she go. When Augustina hesitated he insisted that he would go with her. And I, well I didn't stop Augustina because I wanted to see her happy. Thus, years went past and I was now a blooming doctor, I was finally where I wanted to be in life. I was now twenty-six years old. Six months later when Augustina turned twenty-six as well, I gave her a call and told her that I was on my way to her place for her birthday. I could hear the excitement in her voice after I gave her the news-

After a long trip I finally reached there. I remember that big breath I took before I entered through her front gate, not knowing of what was going to take place. . .As I entered I noticed a lot of police surrounding the place. I dropped my bags and ran with my heart hitting my chest as if it was a drum. I went in the middle in search of an idea of what was taking place. As I looked, I found Augustina lying there helplessly. I dropped down at the result of not being able to take what was in front of me. As I watched her there I started shouting and yelling. I simply couldn't accept the situation. As 1 cried there in front of her I noticed something. - . it was her necklace in her hand and all I could do at that time was sit there staring at it, tying to get a hold of myself. Then I realized what could have been the shocking truth. You see, it was told that Augustina committed suicide but that was not the truth, she was killed and 1 was convinced. Besides win would she kill herself on the same day she had seemed to be looking forward to? It just didn't add up. I immediately went to the police telling them of what the thought. Brandon pulled me away from the police, and told them I was just very emotional so I didn't know what I was saying. I knew I was right, but what troubled me was thought of.. who would try and kill Augustina and why.

I couldn't sleep that night. I kept thinking over and over again. When all of a sudden I had a sort of vision.

In the vision I saw Brandon forcing Augustina into the ocean and Augustina pulling her necklace and holding it tight. It was the scariest feeling that ever came across to me. I got up and started thinking. . .could it be?

Suddenly I heard someone knocking on my door. I knew it was Brandon. At that moment! found myself surrounded by confusion and fear. Yet, I opened the door and let him in. I asked him quietly, "What is wrong, Brandon?" Brandon looked at me arid said, "You know." At that moment I realized that it was he that it was him that killed Augustina. I was appalled at the thought I asked him why he would do such a thing. I simply didn't understand.

Brandon slowly started growing insane and shouting repeatedly, "You shouldn't have come here, everything was fine before you showed up and started being her so called best friend, and it was because of you that she changed? I was shocked; I asked him why he killed her and not me. He did not answer me he just kept telling me that it was my entire fault. I quickly ran out and headed to the police station, where I explained the whole situations.

Once all was figured out, Brandon was arrested for murder. I, I well came back here went on with my life but till this day I wonder why it wasn't me in place of Augustina. All, I know now is that Augustina is my best friend forever and she is in my heart and that well never change"

Eliza-So that is the truth about Ms. Virginia and personally it is a tale I will never forget.

"বহমান জীবনের সুখ-দুঃখ

- ভ্যালেন্টিনা অপর্ণা গমেজ, বারমুদা

সানাইয়ের সুর বাজছে। লোক সমাগমে সারা বাড়ি হৈ হুলে-রে মেতে উঠেছে। আজ মাধবীর গায়ে হলুদ। ছেলে পক্ষকে হলুদ দিতে যাবে বৌদিরা। সবাই যার যার সাজ সজ্জা নিয়ে ব্যস্ত। মাধবীর এ বিয়েতে প্রথমে মত না থাকলেও পরে সে রাজি হয়েছে যখন ছেলেপক্ষ থেকে আশ্বাস দিয়েছে তারা বিয়ের পর মাধবীকে পড়াবে। মাধবী বরাবরই ভাল রেজাল্ট করে এসেছে। তাই ওর ইচ্ছা ডিগ্রী কমপি-ট করবে। মা-বাবা যখন বিয়ের কথাবার্তা আলোচনা করছিলেন মাধবী তাদের জানিয়েছে যদি বিয়ের পর পড়ার সুযোগ থাকে তবে তার আপত্তি নেই। মাধবী খুব রূপসী, স্মার্ট। অনেক প্রস্তাব ছেলেদের কাছ থেকে সে পেয়েছে কিন্তু সে সর্বদাই অনড় থেকেছে। তাই অনেক সময় বাড়িতে নামবিহীন অনেক উড়ো চিঠি এসেছে। মাধবীর অনুপস্থিতিতে কখনো তার মা-বাবা ঐ চিঠি পড়েছেন। সেই থেকে তাদের ভয় যত তাড়াতাড়ি মেয়েকে বিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল। এই বিয়েতে সম্মতি দেবার আগে মাধবীর বাবা-মা খোঁজ-খবর নিয়েছেন ছেলের পরিবার সম্পর্কে। কেউ কেউ বলেছে ছেলে খুবই ভাল, চোখ বুজে সম্বন্ধ কর, আবার কেউ বলেছে ছেলের মা খুব পাজি আর শশুড় কড়া। তবে ছেলের কথা একবাক্যে "ভাল"। প্রথমে একটু গড়িমসি করে পরে ভেবেছেন, ছেলে ভাল থাকলে সব ভাল, শশুড়-শাশুড়ী কতদিন বাঁচবে? আমাদের সমাজে এ ধরনের চিন্তা অনেক পিতামাতাই করে। কিন্তু যখন দেখা যায় মেয়ে তো সইতে পারছে না তখন সেটা মেনে নিতে কষ্ট হয়। মাধবী তার মা-বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনো কিছু করে না আর মা-বাবার বড় সন্তান হিসেবে সে খুব আদরের। মাধবী ছেলের ছবি দেখেই পছন্দ করে নিয়েছে। বিয়ের আগে দু'চারটা চিঠি ও আদান-প্রদান হয়েছে। ছেলেও সুদর্শন, শিক্ষিত, নাম অভিজিৎ। মাধবীর মনের মতই হল তার বর।

খুব ধুমধাম করে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বিয়ের দু'মাস মাধবীর স্বামী দেশে ছিল। চোখের পলকে যেন দিনগুলো উড়ে গেল। ছুটি শেষে স্বামী যখন চাকুরীতে ফিরে গেল মাধবী তখন ভীষণ একা হয়ে গেল। শশুড়-শাশুড়ী বুড়ো মানুষ, তাদের সাথে কি কথা বলবে? একটাই দেবর, তাও সে ঠিকমত বাড়িতে থাকে না। ননদ তো বিয়ে হয়ে শশুড় বাড়িতে। ননদ নাইয়র এলে মাধবীর সময়টা খুব ভাল কাটে। যেহেতু সমবয়সী তাই কথাবার্তায় ভালই জমে। সংসারের অনেক ছোটখাট দুঃখ-কষ্টের মাঝে কিছু কিছু সুখ থাকে, কিছু ভাললাগা থাকে যাবে জীবনের পরম পাথেয় বলে মনে হয়। তা না থাকলে হয়ত মানুষ বাঁচার স্বপ্নই দেখত না। মাধবীর জীবনে এখন তার স্বামীর একটা চিঠি প্রতি সপ্তাহের স্বপ্ন। কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে আনমনে পথের দিকে চেয়ে থাকা এও এক ধরণের আশা।

বিয়ের পর বাস্তবার কঠিনতা ধীরে ধীরে মাধবী বুঝতে থাকে। বিয়ের আগে সে রান্নার কাজ তেমন রপ্ত করতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝে শাশুড়ীর কাছে অনেক রকম কথা শুনতে হত। মাঝে মধ্যে তিনি দেখিয়ে দিলেও কথার খোঁচাতে সে খাবার মাধবীর কাছে বিষ বলে মনে হত। একা একা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে মাধবী কাঁদে আবার কেউ দেখে ফেলবে সেই ভয়ে চোখে-মুখে জল দেয়। মাধবী খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগে। শশুড়-শাশুড়ী মুখ ধোয়ার সাথে সাথে টেবিলে তাদের চা রেডি। দুপুরে গরম ভাতের নাস্তা না হলে শশুড় চেঁচামেচি করেন। সংসারের সব কাজ করে আবার গভীর রাত পর্যন্ত মাধবী পড়াশুনা করে। পড়ার ব্যাপারে তার স্বামী তাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিচ্ছে। কখনো কখনো পড়াশুনায় দৃঢ় মনোযোগের কারণে বেশী রাত হয়ে যায় তাই সকালে উঠতে দেরী হলে শাশুড়ীর কথার খোঁচাতে মাধবীর সারা দিনটাই মাটি হয়ে যায়। প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে মাধবীর ননদ নাইয়ড় আসে। অথচ মাধবীকে নাইয়ড় নিতে এলে শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকানো যায় না। কত অজুহাতে কত বার মাধবীর মা-বাবাকে শূণ্য হৃদয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর মেয়েরা বাপের বাড়ি নাইয়ড় আসার জন্য একটু ব্যাকুল হয়েই থাকে তা সে যত সুখেই থাকুক। কতবার মাধবী ব্যাগ গুছিয়ে নাইয়ড় যাবার প্রত্যাশায় থেকেছে। অথচ প্রতিমাসে তার নিজের মেয়েটা নাইয়ড়ে না এলে কত কথার পাহাড় জমায়। মাধবীর ননদ খুব বুদ্ধিমতি এবং সুন্দর মনমানসিকতার মেয়ে। নিজের ইচ্ছেগুলো পূর্ণ না হলেও ননদকে কিছুদিনের জন্য কাছে পেয়ে মাধবী খুশী থাকে। ননদের বাচ্চাটাকে নিয়ে মেতে থাকে।

মাধবীর ব্যস্ততা বেড়ে যায়। শশুড় বাজার থেকে রকমারী খাবার-দাবার, শাক-সব্জী নিয়ে আসেন। নাতীনের জন্য চিপ্স চকোলেট আরও কত কি। মাধবীর রান্না করার হাত এখনো এতটা পাকেনি তাই মাঝে মাঝে ননদের কাছ থেকে জেনে নেয়। কখনো দেখা যায় ননদ বৌদিকে উঠিয়ে দিয়ে নিজেই রাঁধতে বসে। মেয়েকে রান্না ঘরে বসতে দেখলে শাশুড়ীর চোখ গরম হতে থাকে। "আচ্ছা বৌ তো। মেয়েটা আমার নাইয়ড় এসেছে, ঘুরে ফিরে খাবে তাকেও বসিয়েছে রান্না ঘরে? বলি রান্নাটাও শিখতে পারনি এখনো। বিয়ের আগে কি শিখেছ তাহলে?" মাধবী তো কেঁদেই আকুল। বৌদিকে কাঁদতে দেখে ননদের মনে কষ্ট হয় তাই মাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, "এভাবে কথা বলাটা তোমার ঠিক না মা। বৌদি আমাকে রান্না ঘরে বসায়নি এবং আমি নিজের ইচ্ছেতে বসেছি। আমিও বিয়ের আগে রান্না শিখে শশুড় বাড়ি যাইনি, ও বাড়িতে আমাকে ধরে ধরে শিখিয়েছে। তাই বলে তারা তো আমাকে কটাক্ষ করেনি কখনো।"

শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর নীচু হয়, সামান্য বাকা হাসিতে বলেন, "তখন তোর বয়স কম ছিল।" মায়ের কথার পিঠে মেয়ে ও জবাব দিতে থাকে। বৌমার স্বপক্ষে মেয়েকে কথা বলতে শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেন। মায়ের উত্তেজনা দেখে মাধবী ঘাবড়ে যায়, ননদের হাত ধরে মাকে শান্ত করতে বলে। কারণ, এমনিতেই তিনি প্রেসারের রুগী, শেষে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সারা জীবন মাধবীকে দোষী হয়ে থাকতে হবে। বৌদির অনুরোধে মেয়ে মাকে ধীরে ধীরে শান্ত করার চেষ্টা করে, "এই যে তুমি বললে আমার অল্প বয়স ছিল, যখন আমার বিয়ে হয়েছে, হ্যা, মানলাম ছিল বয়স কমই, কিন্তু আমাকে রান্নাটা শিখিয়েছে আমার শাশুড়ী। আমি তেমন কিছু তো বিয়ের আগে করিনি কিন্তু আমার শাশুড়ী মা আমাকে সব কিছু শিখিয়েছে। তুমি এখন শাশুড়ী হয়েছ, তোমার ঘরের বৌকে তুমিই তো শেখাবে। "মেয়ের কথাগুলো শুনতে তার ভাল লাগল না। মুখটা ভার করে পান চিবুতে চিবুতে বাইরে গেলেন। মাধবীর ননদ যে ক'দিন থাকে তার মনটাও ভাল থাকে। কিন্তু সুখের মুহূর্ত খুব দ্রুত দৌড়ায়। তাই আবার সেই একই রকম বিষন্ন দিনগুলো ফিরে আসে। মাঝে মাঝে তার খুব কষ্ট হয় তবুও সে তার স্বামীকে কোন ব্যাপারে লেখেনা। এমনিতেই চাকুরীরর জানমারা খাটুনী, তার উপর যদি তার কষ্টের কথা লেখে বেচারা একা একা আরো কষ্ট পাবে। শরীরে কষ্ট সয় কিন্তু মনের কষ্ট শরীরকেও ভেঙ্গে ফেলে। যতই দিন যায় মাধবীর পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসে। সেই সাথে ঘনিয়ে আসে স্বামীর বাড়ি ফেরার দিন। ঠিক পরীক্ষা শেষের পরের সপ্তাহে মাধবীর স্বামীর বাড়ি আসবে। পরীক্ষাতে আরো ভাল প্রিপারেশন নেবার জন্য মাধবী বাপের বাড়িতে যেতে চায়। শত হলেও শশুড় বাড়ীতে কাজকর্ম সেরে ততটা ফ্রি সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু মাধবীর শাশুড়ী বলেন, ছেলে তো এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলেনি। মাধবী তাকে জানায়, আজ-কালের ভিতরেই হয়ত চিঠি এসে পরবে, তোমার ছেলে চিঠিতে লিখেছে। তিনি সেই অপেক্ষাতেই রইলেন। অথচ এদিক দিয়ে মাধবীর পরীক্ষার সময়ও এগিয়ে আসতে থাকে। মাধবীর টেনসনও বাড়তে থাকে। কারণ, তার আরো একটু ফ্রি সময়ের প্রয়োজন। অবশেষে চিঠি এলো পরীক্ষার মাত্র পাঁচ দিন আগে। মাধবীর শাশুড়ী মনে মনে খুব একটা খুশী নন, যদিও বিয়ের আগে মাধবীকে বৌ করে আনার উদ্দেশ্যে পড়ানোর কথাটা তিনি এক গাল হেসেই বলেছিলেন। বইপত্র গুছিয়ে মাধবী দেবরের সাথে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। এতদিন পর মেয়েকে কাছে পেয়ে মাও মহাখুশী। কি রেখে কি করবেন, কি খাওয়াবেন, যেন তার অফুরন্ত ব্যস্ততা। পড়ার সময়ে কেউ যেন বিরক্ত না করে সেদিকেও সর্বদা তার খেয়াল। পরীক্ষার টেনসনে মায়ের সাথে বসে মন খুলে তেমন কথাবার্তা বলা হয়নি। মাধবী মনে মনে ভেবেছে পরীক্ষা শেষ হলে ২/৪ দিন থেকে যাবে। দেখতে দেখতে পরীক্ষাও শেষ হল। পরীক্ষা শেষ হলে মাধবী যেন উৎফুল-তা অনুভব করল। মায়ের পাশে বসে অনেকদিন পর প্রাণ চাঞ্চল্য মনে কথা বলছে, নতুন নতুন আশার কথা বলছে। মাও কত রকম চিন্তা ভাবনা করছেন ক'টা দিন মেয়েকে কি খাওয়াবেন, কোথায় বেড়াবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এদিকে বিকেল গড়াতেই দেবর এসে হাজির। তাকে দেখেই মাধবী বুঝতে পেরেছে খবর এসে গেছে। কারণ এর আগেও এমনটি কয়েকবারই হয়েছে। মাধবীর প্রাণচঞ্চলতা মুহূর্তেই হারিয়ে যায়। যতবার সে নাইয়ড় আসে ততবারই না হয় শাশুড়ী নয়তো শশুর অসুস্থতার খবরে তাকে চলে যেতে হয়। অনাকাঙ্খিত ইচ্ছেগুলোর সমাধি হয় বার বার।

মাধবী ব্যাগ গুছিয়ে মাকে বলে, এরপর সহজে আসব না। তিন মাস পর পর এসে অনেকদিন থাকব। মা বোঝেন এটা মেয়ের দুঃখের কথা। মাধবী দেবরের সাথে ফিরে এলো শশুরালয়ে। প্রথমেই নিয়মমত শাশুড়ীর নিকট আশীর্বাদ চেয়ে তার পাশে বসল। সকল কুশলাদি জিজ্ঞাসা করল। শাশুড়ী বসে বসে উহ্ আহ্ শব্দে ঘুরে ফিরে নড়াচড়া করছেন। কোমড় ব্যথার রোগ তার অনেক দিনের কিন্তু মাধবী ভেবেছিল সিরিয়াস কিছু। মাধবী সবই বোঝে তাই নিজের মনের সাথে একা একা কথা বলে, তার নাইয়ড় থাকাটা তাদের পছন্দ নয়। অথচ নিজের মেয়েকে সময় মত নাইয়ড় না দিলে কত কথা। মাস শেষ হতে না হতেই ছোটেন মেয়েকে নাইয়ড় আনতে, কেন এমন বিবেচনা? তার পেটের মেয়ে যদি তার কষ্ট হয়, তাহলে

ছেলে বৌ তার মা-বাবার কি কষ্ট হয় না? নিজেদের জন্য আমরা কতটা স্বার্থপর, কতখানি বিবেকহীন। মাধবীর মনে হাজারো প্রশ্নের তুফান ওঠে কিন্তু বাহ্যিকভাবে তা বোঝার সাধ্য নেই। নিজেকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করে, "কি জানি এটাই হয়ত আমার ভাগ্য। আর তাদেরইবা দোষ দেই কি করে, তারাও কষ্ট করে ছেলেকে বড় করেছেন তাই বৃদ্ধ বয়সে নিজেদের মত করে সবকিছু পেতে চান। আবার অন্যদিকে আমিও ছেলের বৌ, আমারও তো অনেক কিছু চাওয়ার, পাওয়ার আছে। দু'দিকের সম্পর্কটাই শক্তিশালী। স্বামীর মনে দু'দিকের জন্যই অগাধ ভালবাসা। মাধবী যদি স্বার্থপর হতে চায় তাহলে বৃদ্ধ মা-বাবা কষ্ট পাবে। কাউকে কষ্ট পেতেই হয় এযে সংসারের রীতি। কিন্তু মাধবী ততটা স্বার্থপর নয় তবে তার একটা মন্তব্য, কেউ যদি তার জন্য হাটুজল নামে সে তার জন্য বুক জলে নামবে। কিন্তু শুধু বঞ্চিত হতেই থাকবে সেটা মেনে নেয়া কষ্টকর।

মাধবীর মন-মানসিকতা বিষন্ন হলেও কিছুদিন পর তার স্বামী বাড়ি আসবে সেই আশাতে আবার নতুন ভাবে তার মনে সাহস - শক্তি সঞ্চারিত হয়। ঘর-দোর ঝাড়া মোছার কাজে ব্যস্ততায় দিন পার হয়। মাধবীকে তার স্বামী এয়ারপোর্টে যেতে বলেছে, প্রথম দর্শনেই তার মুখটি যেন তাকে মুগ্ধ করে। অনেক না পাওয়ার মাঝে তার এ ইচ্ছেটা পূর্ণ হয়। এয়ারপোর্টে মাধবী সময়মত পৌঁছে যায়। দুর থেকে যখন সে অভিজিৎ-কে দেখে, প্রচন্ড খুশীতে তার চোখ বেয়ে জল আসে। অভিজিৎ দেখার আগেই রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে। দু'হাতের লাগেজ মাটিতে রেখেই সে মাধবীর কপালে একটা চুমু আঁকে। মাধবী লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে, তার সর্ব শরীর শিউরে ওঠে। পাশে দাঁড়ানো দেবর মাথা নীচু করে কাঁশি দেয়। অভিজিৎ ভাইকেও বুকে জড়িয়ে ধরে।

দু'ভাইয়ের মধ্যে কথাবার্তা হয়, দেবর-বৌদির হাসি-ঠাট্টাও জমে ওঠে। মাধবীর স্বামী মনে মনে একটি বাসনা নিয়ে এসেছে। উভয়েরই স্বপ্ন এবার তারা একটি বাচ্চা নেবে। আর দাদা-দাদী হবার স্বপ্ন তো বৃদ্ধ কালের সম্বল। বাড়িতে অভিজিৎ মা-বাবার আশীর্বাদ নেয়, তাদের পাশে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে। স্বামীকে প্রাণদিয়ে সেবা করার ব্যস্ততায় মাধবীর দিনগুলো স্বপ্নের মতো মনে হয়। যতই দিন যায় ততই উভয়ের ভালবাসা বাড়ে সেই সাথে কষ্টও বাড়ে বিচ্ছেদের। অভিজিৎ সুযোগ পেলেই মাধবীর পাশে ছুটে যায়। ঘরে নিরিবিলি সময়ে দু'জনে মন খুলে কথা বলে। কিন্তু অভিজিৎ-এর মায়ের কাছে ছেলে-বৌ-এর এত অন্তরঙ্গতা ভাল লাগে না, তার কাছে আদিক্ষ্যতা বলে মনে হয়। অথচ স্বল্প সময়ের জন্য মাধবীর জীবনটা যেন সুখের জোয়ারে পূর্ণ। এটুকু সুখই যেন দুর্লভ প্রাপ্তি।

দিন যায় মাধবীর মনটা বিষন্ন হতে থাকে। আর মাত্র ক'টা দিন তারপর তার মনের মানুষ কত দুরে চলে যাবে। কতগুলো মাস তাকে একা থাকতে হবে। আবার সেই একটি চিঠির জন্য চাতকের মত তাকিয়ে থাকবে। অভিজিৎ মোটামুটি ভাল চাকুরী করছে তাই তার চিন্তা-ভাবনা বাড়িতে একটা ফোন হলে ভাল হয়। মা-বাবাকে জানালে তারা আপত্তি করলেন কিন্তু অভিজিৎ মানলনা। যাবার ৩/৪ দিন আগে বাড়িতে ফোনের ব্যবস্থা করল। এই নিয়ে বাড়িতে ভীষণ মন কষাকষি। তাদের ভ্রান্ত মন্তব্য যে, তাদের ছেলে বদলে গেছে তাই তাদের কথার মূল্য নেই। অভিজিৎ-এর ভীষণ কষ্ট লাগল, ছুটির প্রথম তো ভালই কাটল, কিন্তু যাবার আগমুহুর্তে কত অশান্তি। মুখ-বুঁজে সব কথা সহ্য করে অভিজিৎ বিষন্ন মনে বাড়ি থেকে চলে গেল। মাধবীর দুঃখ হল, তার স্বামী কত কষ্ট নিয়ে বাড়ি ছাড়ল। মাধবী আবার একাকী। দিন কাটছে, ধীরে ধীরে সে অনুভব করছে শরীরের ভিতর সামান্য পরিবর্তন। খাব রে রুচি লাগে না, মাথা ঘোরে, বমি ভাব হয়। শাশুড়ী বুঝতে পারেন। ডাক্তারের কাছে গিয়ে মেক্ সিয়র হন সত্যিই সে প্রেগনেন্ট। অভিজিৎ-এর ফোন এলো - ফোনটা তুলে সে প্রথম শশুর-শাশুড়ীকে কথা বলতে দিল। শুভ খবরটা তারাই ছেলেকে জানাল। অভিজিৎ খুশীতে মাধবীর সাথে কথা বলার জন্য ব্যাকুল হল। পেছনের সব দুঃখ ভুলে গেল দু'জনে। আবার নতুন একটা স্বপ্ন নিয়ে দু'জনের আলাপচারিতা শুরু হল। জীবন থেকে কিছু হারালেও আবার ভিন্ন কিছু সুখ ফিরে আসে, আর সেটাই জীবনটাকে সময়ের স্রোতে বয়ে নিয়ে যায় জীবনে সামঞ্জস্যতা ফিরে আসে।

লেখা আহ্বান

"তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

দ্বিতীয় বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সম্মেলন

(ব্যবস্থাপনায় ম্যারীল্যান্ড, ওয়াশিংটন ডি,সি এবং ভার্জিনিয়ার খ্রীষ্টান সম্প্রদায়)
৩৩০১ স্যার থোমাস ড্রাইভ, #৩১
সিলভার স্প্রীং, ম্যারীল্যান্ড ২০৯০৪-৪৮৮৯
টেলিফোন: (৭০৩) ৭৪১-৭১২২, (৩০১) ৩৫১-৮৫১৯, ফ্যাক্স: (৩০১) ৮৯০-৫১৩৯
ই-মেইল:convention2005@hotmail.com

সুধীবৃন্দ,

আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহন করুন। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমরা আপনাদের জন্য আগামী ২রা জুলাই, শনিবার এবং ৩রা জুলাই, রবিবার, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ, সিলভার স্প্রীং, ম্যারীল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সম্মেলন সংগঠিত করছি। উওর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে এবং কানাডা থেকে সকল বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সংঘ এবং সমিতি ও বহু খ্রীষ্ট ভক্ত এ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করবে। বিভিন্ন দেশ থেকেও আমরা বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ভাই, বোনদের উপস্থিতি আশা করছি।

এই সম্মেলনে অংশ গ্রহন করে সকলেই মতবিনিময় ও চিন্তাধারার আদান প্রদান করার সুযোগ পাবে। আমাদের সমাজের তরুনরা আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করার সুযোগ পাবে। দু'দিনের সম্মেলনে থাকবে প্রধান অতিথি আমাদের রাষ্ট্রদূত ও বিশেষ অতিথিদের ভাষন (৩টি), বিতর্ক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সংস্থার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের সংগীত। অংকন শিল্প প্রদর্শনী এবং বিশেষ আকর্ষন মিনা-বাজার। সেখানে থাকবে হরেক রকমের বিপনি। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান এ সম্মেলনের কোন অংশের ব্যায়ভার অথবা উপহার প্রদান বা আর্থিক সাহায্য দিয়ে সহযোগীতা করতে চান, তাহলে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের বিশ্বাস এ সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের সমাজের জনগনের মাঝে সুদৃঢ় হবে সমঝোতা, বিশ্বাস এবং আস্থা। সর্বপরি আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মঙ্গলবাণীর আলোকে, আমরা এই প্রবাসে গড়তে পারবো একটি সুশীল সমাজ। পরিশেষে এ সম্মেলনকে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের একান্ত প্রয়োজন, আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহন, সহযোগীতা এবং প্রার্থণা।

সকলকেই জানাই বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।

সকল কনভেনসন কমিটি ম্যাম্বারদের পক্ষে:
হিউবার্ট অরুন রোজারিও, কনভেনর
ফেলিক্স মার্সিয়ান গমেজ, মহাসচীব

স্পাই

- মেরী ডি'কস্তা

ক্যানাডার টরেন্টো মহানগরী। মধ্যগ্রীষ্মের বিকেল সাতটা। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। গ্রীষ্মকালে সূর্য ডুবে ন'টা নাগাদ। তাই তখনও রোদে চারিদিক ঝলমল করছে। রোদ থাকলেও তাপে তেমন তীব্রতা নেই।

গ্রীষ্মকাল এখানকার মানুষ খুব উপভোগ করে। প্রায় প্রত্যেকেই মনোযোগ দেয় বাগান ও লনের দিকে। সব্‌জি ও ফুলের বাগান করা এবং লনের ঘাস কাটা ও পানি দেওয়া নিয়ে মানুষগুলো কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এসময় বাড়তি কাজ করতে হলেও তারা তা প্রচুর আনন্দ নিয়ে করে। ছোট ছেলে মেয়েরা তাদের ড্রাইভওয়েতে অথবা ফুটপাথে খেলা করে।

মারীয়া প্রায় প্রতিদিনই নিজ ঘর ও বাগানের কাজ সেরে তার মাকে দেখতে যায়। মা থাকেন তার বাড়ী থেকে মাত্র মিনিট দশেকের হাঁটা - পথের ব্যবধানে।

স্বাস্থ্য সচেতন বলে সে এ হাঁটাটুকুকে কষ্টকর ভাবে না। মাকে দেখতে গিয়ে তার ব্যায়ামও হয়ে যায়। তাছাড়া বিভিন্ন পারিবারিক বাগানের বৈচিত্রময় ফুলের সমাহার ও তাকে আনন্দ দেয়।

মারীয়ার বয়স পঞ্চাশ হলেও তাকে দেখলে মনে হয় বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী হবে না। তার নির্ঝঞ্ঝাট ছোট্ট সংসার। ছেলে জর্জ বড় - বউ নিয়ে থাকে টরোন্টোর অদূরে অশোয়া নামক উপশহরে। সে এ্যাকাউন্টিং পড়া শেষ করে ব্যাঙ্কে চাকুরীরত। মেয়ে এল্‌সী ছোট - বিয়ে - থা করেনি। সে এয়ার ক্যানাডার ফ্লাইট এট্যান্ডডেন্ট ; বাবা - মায়ের সঙ্গেই থাকে। স্বামী এ্যান্থনী মোটর ম্যাকানিক হিসাবে কাজ করে।

মারীয়া নিজে স্থানীয় একটি হাসপাতালে দীর্ঘ আঠার বছর ধরে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত। তার মাতৃভূমি পর্তুগালে। কোন্ ছোট্ট বেলায় বাবা - মায়ের সঙ্গে সে ক্যানাডায় ইমিগ্রান্ট হয়ে এসেছে মনেও করতে পারে না।

মারীয়া গ্রীষ্মের প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল তার বৃদ্ধা মায়ের বাড়ীর দিকে। হঠাৎ একটি বিড়ালের মিউমিউ ডাকে তার হাঁটায় ছন্দপতন ঘটে। সে চতুর্দিকে তাকিয়ে বুঝতে চায় কোথা থেকে এ আওয়াজ আসছে। বিড়ালটি তার পিছনে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ডাকছে। বুঝতে তার বাকী রইল না এটি হারিয়ে - যাওয়া একটি বিড়াল। বিড়ালটির গলায় ছোট্ট বেল্ট বাঁধা আছে দেখে মারীয়া আশান্বিত হয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে বেল্টে লেখা মালিকের টেলিফোন নম্বর দেখার চেষ্টা করে। বিড়ালটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বিড়ালটি পালিয়ে যাওয়ায় নম্বরটি আর দেখা হল না। তখন ওর মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে ক্ষণে ক্ষণে বিড়ালটির প্রসঙ্গেই ফিরে আসছিল। অন্যদিনের তুলনায় আজ একটু আগেই সে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিল।

বাড়ী ফিরে আসার পথে বিড়ালটিকে আর না দেখে সে আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে, এটা হারিয়ে - যাওয়া বিড়াল নিশ্চয়ই নয়; ইতিমধ্যে ওটি হয়তো তার মালিকের বাড়ী ফিরে গেছে।

বাড়ী এসে মারীয়া দেখতে পায় স্বামী ততক্ষণে কাজ থেকে ফিরেছে। সবিস্তারে সে বিড়ালটির ঘটনা তাকে জানাল। ঠিক এমনি সময় বাড়ীর পেছনের বাগান থেকে বিড়ালের ডাক শোনা গেল। মারীয়া তড়িঘড়ি করে পেছনের দরজাটি খুলতেই বিড়ালটি দৌড়ে এসে ওদের ঘরে ঢুকে পড়ল। সে কাছে গিয়ে কোলে নিতে যেতেই বিড়ালটি তার হাতে আঁচড় কেটে দৌড়ে দু'তলায় ওদের শোবার ঘরে ঢুকে এক লঙ্কাকান্ড বাঁধিয়ে তুলল। বিড়ালটিকে বশে আনতে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে স্বামী - স্ত্রী দু'জনেই সোফায় বসে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মেয়ে এল্‌সী কাজ থেকে ফিরে এসেছে। সব ঘটনা শুনে সে ফ্রিজ থেকে এক বাটি দুধ নিয়ে ঘরের মধ্যিখানে রেখে এল। অদ্ভুত ! সুবোধ শিশুর মত বিড়ালটি চুক্ চুক্ করে দুধ খেতে শুরু করল। এল্‌সী খুব কায়দা করে বিড়ালের গলার বেল্টে লেখা মালিকের টেলিফোন নম্বর জেনে দ্রুত তাকে ফোন করল।

বিড়ালটির মালিক একজন বৃদ্ধা। থাকেন পার্শ্ববর্তী আরেকটি উপ শহর মিসিস্যাগায়। তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে, কয়েকদিন পূর্বে তার টরোন্টোবাসী - কন্যা বিড়ালটিকে এসে নিয়ে গেছে। বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন আর আগের মত তিনি বিড়ালটির যত্ন নিতে পারছিলেন না। খুব সম্ভবত ঃ তার মেয়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে বৃদ্ধাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে ঐ বিড়ালটি ।

বৃদ্ধা সেই রাতেই কন্যার সঙ্গে যোগাযোগ করে মারীয়াদের বাড়ী এসে হাজির। তখন বিড়ালটি তার কাছে এসে দাঁড়াতেই বৃদ্ধা তাকে কোলে তুলে নিলেন। বিড়ালটি খুশীতে গড়্ গড়্ আওয়াজ করতে লাগল। বৃদ্ধা হাত বুলাতে বুলাতে জানালেন বিড়ালটির নাম 'স্পাই' । রাত প্রায় বারোটা নাগাদ স্পাই সহযোগে তিনি ও তার কন্যা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

এদিকে মারীয়াও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

AMAR EK CHHOTISI STORY -6

- Hubert Arun Rozario, Dale City Virginia

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রদেশগুলোর পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের প্রতি এবং শিশুদের প্রতি অত্যাচার এবং অবিচার নতুন কোন ঘটনা নয়। প্রতিদিনই পুরুষশাষিত বিত্তবানদের দারা নির্যাতিত হচ্ছে নারীসমাজ, শিশুরা, অসহায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আদিবাসীগণ। দুঃখের বিষয়টি হচ্ছে যে এই নির্যাতিত জনগোষ্ঠিই আমাদের দেশের জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা আইনের শাসনের অবর্তমানে কোন ন্যায্য বিচার পায় না। বর্তমানে দক্ষিন এশিয়ার অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠি পুলিশ দেখলেই আঁতকে উঠে কারন তারা জানে পুলিশই হচ্ছে ভক্ষক রক্ষক নয়। তারা অপরাধীর দোসর।

আমাদের জীবনে অনেক ঘটে যাওয়া সত্য কাহিনী খুবই অভিনব। এ সব সত্য ঘটনা মানুষের প্রতি মানুষের করুন অবিচার, লাঞ্ছনা ও অবমাননার এক করুন কাহিনী। ভারতের সংবাদপত্র "হিন্দুস্থান টাইমস্" এ আমি একটি ঘটনা প্রথমে পড়ি, সাথে সাথে হৃদয়টা আমার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। অনুধাবন করতে থাকি, যে মানুষের হৃদয় কতটা পাষান হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে আইনের শাসনের অবর্তমানে আমাদের গরীব অসহায় জনজীবন হয়ে উঠেছে অন্যায্যতায় ভরা এক বিষময় জীবন। দেশের সাধারন মানুষের দুর্ভোগের সীমা ছেড়ে যাচ্ছে। "আইনের সাবলিল গতি নিভৃতে কাঁদছে। আমাদের দেশে সব স্থানেই ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত থাকতে দেখে থাকি। নির্মম দারিদ্রতা তাদের জীবনটা রক্ষার্থে এ পথ অবলম্বন করতে হচ্ছে। কিন্তু তাদের অতি সামান্য দক্ষিনা থেকে, বড় অংশ কেড়ে নিচ্ছে "গডফাদাররা" আবার তাদের থেকে অংশ পাচ্ছে পুলিশ। এ নির্মম ব্যবস্থায় মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা এবং সম্মানের মৃত্যু ঘটেছে। আমরা এ সমস্ত কম বেশী সকলেই জানি, তবে আমি জানতাম না যে গডফাদাররা এখন দেশ। থেকে ভিক্ষুক রপ্তানী করে বিদেশে। এখন গডফাদাররা দেশের টাকার প্রতি আগ্রহ কমে গেছে, তারা তাদের পরিচালিত ভিক্ষুকদের থালায় দেখতে চায় ডলার, চায় না টাকা, চায় না রুপিজ। বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে এ অপকর্মের এক বলিষ্ঠ চক্র তৈরী হয়ে গেছে। সেখানে আমাদের দেশের ভিক্ষুকরা আরও বেশী নিগৃীহিত হচ্ছে, বেশীর ভাগ ভিক্ষুককে কারাবরন করতে হচ্ছে, অনেকে করুণভাবে মৃত্যুবরন করছে।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে বর্তমানে নারী পাচারকারী দেশ হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে। আমাদের সমাজ আর সুশীল নেই, আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি, আমাদের সামনে অন্ধকার। বিশ্বের অনেক দেশ যেমন, গণতন্ত্র, মুক্ত অর্থনীতি, আইনের শাসন, সকল সম্প্রদায়ের সম-অধিকার ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে যাচ্ছে, একই সময়ে আমাদের সনাতন এশিয় মূল্যবোধ, প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং শান্তিময় সুশীল সমাজ জিম্মি হয়ে যাচ্ছে, অশুভ রাজনীতি এবং সন্ত্রাসের কাছে।

আমি জানতাম না যে পবিত্র হজ্জের সময় আমাদের দেশ থেকে দুঃস্থ, ভূখা এবং প্রতিবন্ধীদের সৌদি আরবে, গডফাদাররা নিয়ে গিয়ে বিদেশী মুদ্রায় কোটি কোটি টাকা আয় করে। ধর্মপ্রাণ মুসল-ীদের দানে মাস চারেকের মধ্যেই আমাদের দেশীয় ভিক্ষুকরা প্রচুর বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করে, তারা শুধু সে মুদ্রা দেখে কিন্তু ভাগ পায় না।

আমার এ সত্য কাহিনীর অভাগা মধ্যমনীর নাম লায়লা। এ কাহিনী লায়লার জীবন কাহিনী - নিরেট সত্য ঘটে যাওয়া ঘটনা। ১৩ বছরের ফুটফুটে সুন্দরী কিশোরী লায়লা, ভারতের বেলডাংগা থানার দয়ানগর গ্রামের এক বিত্তহীন, গরীব দীন - মজুরের তিন সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সন্তান। সুন্দরী লায়লা তৃতীয় শ্রেনীর মেধাবী ছাত্রী কিন্তু ও একটু খুঁড়িয়ে হাটে। লায়লার বা পা ডান পায়ের চেয়ে সামান্য ছোট। এ জন্যে মা বাবা তাকে একটু বেশী ভালবাসত।

এক সুন্দর সকালে "ম্যান পাওয়ারের" দুজন এজেন্ট তাদের গৃহে এক লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। সুচতুর ভাবে তারা লায়লার পিতা - মাতাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, যেহেতু লায়লা খুঁড়িয়ে চলে, তাই ওর বিয়েতে প্রচুর টাকার যৌতুক লাগবে।

যেহেতু তারা মুসলিম, তাই তারা লায়লাকে হজ্বে নিয়ে যাবে - তাতে মেয়ে এবং সমস্ত পরিবারের উপর আল-াহ্‌র অশেষ তৌফিক বর্ষিত হবে এবং এজেন্টরা লায়লার বিয়ের জন্য ৩০ হাজার রুপিজ দেবে। এ প্রস্তাবে গরীব পিতা-মাতা হকচকিয়ে উঠল, প্রথমে অরাজী হলেও, পবিত্র হজ্ব, মক্কা, মদিনার পবিত্র দৃশ্য স্মরণ করে রাজী হয়ে গেল।

এক হজ্ব যাত্রীর সন্তান সাজিয়ে লায়লাকে সৌদিগামী জাহাজে তোলার পরই, দালালদের চেহারা পাল্টে গেল। লায়লার ভাল জামা, জুতা, সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোল। ছেড়া জামা পড়িয়ে তাকে ভিখারী সাজিয়ে ভিক্ষা করতে বাধ্য করা হোল। এ ভাবে আরব দেশে গিয়েও শহরের রাস্তায় রাস্তায়, ভীষন গরমে, খালি পায়ে ভিক্ষার থালা নিয়ে, লায়লাকে সারাদিন হেঁটে হেঁটে ভিক্ষা করতে হতো। থালায় কিছু জমলেই তারা তুলে নিয়ে যেত। ভিক্ষা কম হ'লে, রাতে হাত পা বেধে বেদম প্রহার করা হতো। সারাদিনে একবার সামান্য খাবার দেয়া হতো। গডফাদাররা চাইত, লায়লা যেন দিন দিন ক্ষীন হয়, দুর্বল হয়। তাতে আরও বেশী ভিক্ষে পাওয়া যাবে।

এক রাতে অকল্পনীয় দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কিশোরী লায়লা রক্তাক্ত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সকালে কাউকে না দেখতে পেয়ে, লায়লা পালায় - রাস্তায় বেড়িয়ে দৌড়াতে থাকে। একসময় এক বাংলাদেশী ভদ্রমহিলা তাকে ধরে, পানি খেতে দেয় এবং ক্রমে, লায়লার করুন কাহিনী শুনে - তাকে নিজ গৃহে নিয়ে, শুশ্রুষা করে। লায়লা সে গৃহে অনেক স্নেহ ও মমতায় আশ্রয় পায়। একদিন তাকে বাংলা স্কুলে ভর্তি করা হয়। পাঁচ বছর পড়ে ভদ্রমহিলাটি নিজ পরিবারের এক জাতি ভাই এর সাথে, লায়লার অনুমতি নিয়ে, বিয়ে দেয়। ক্রমে লায়লার এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয় এক হাসপাতালে। সেখানে লায়লার পাসপোর্ট এবং আনুসাঙ্গিক কাগজ-পত্র না থাকার কারনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে, যেহেতু লায়লা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে, তাই সরকার, মেয়েসহ, লায়লাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

ঢাকা বিমানবন্দর এসে, অচেনা জায়গায়, অচেনা মানুষের মাঝে, লায়লা, কন্যাকে নিয়ে, মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। নারী - পাচার রোধ করতে এবং পতিতা বৃত্তি রোধ কল্পে, ইদানিং, মানবাধিকার সংস্থার অনেক সমাজ কর্মী, বিমান বন্দরে আসা যাওয়া করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য মহৎ। এমনি এক মহিলা নেত্রী, লায়লার কাছ থেকে সব জেনে, তাকে নিরাপদে থাকার জন্য এক গাড়ীতে, এক প্রাসাদোপম বাড়ীতে নিয়ে আসে। সমাজ কর্মী এবার লায়লার কাছ থেকে আদর করে, শিশু সন্তানটিকে নিয়ে সোজা দু'তলায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে নিঃসন্তান শিল্পপতির পত্নীর কাছে, পাঁচহাজার ডলারের বিনিময়ে শিশুটিকে বিক্রি করে তড়ি ঘড়ি প্রাসাদ থেকে কেটে পড়ে। লায়লা অনেক কান্নাকাটি করেও তার শিশু সন্তানকে আর দেখতে পারল না। দু'জন গৃহ ভৃত্য, এসে লায়লাকে দুহাজার টাকা নিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিল। লায়লা তা প্রত্যাখ্যান করল। কিভাবে সে তার একমাত্র মধ্যমনিকে ছেড়ে দেশে ফিরে যাবে। এবার ভৃত্যদ্বয় লায়লাকে একটি ঘরে বন্ধ করে, বেদোম প্রহার করল ও একটি ঘুমের ইনজেক্শন দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

সেই সন্ধ্যায় ধনী- বিত্তশালী এবং ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে খানা-পিনা করতে এলো শহরের পুলিশ সুপার। শিল্পপতীর স্ত্রী পুলিশ সুপারকে বলে-ন যে এক নতুন আয়া তাদের একমাত্র কন্যা সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, আল-াহ্‌র অশেষ রহমতে তারা সন্তানকে ফিরে পেয়েছে এবং অপরাধীকে আটক করেছে। পুলিশের মন, তাই চট করে তিনি বুঝে ফেললেন যে, নতুন চাকরানী বৃহৎ এক ছেলে - ধরার দলের সদস্যা। পুলিশ সুপার আইনের প্যাঁচে আদালত থেকে রায় এনে লায়লাকে সাত বছরের জন্য কারাবরণের জন্য ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল।

সাত বছর পরে এক মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রির সাথে লায়লার পরিচয় হয়। লায়লার আগে ছাড়া পেয়ে, পত্র লেখে লায়লার পিতা-মাতার কাছে সব জানায় এবং মাস দুয়েকের মধ্যে তার মুক্তি হবে বলে তাদেরকে নিজ বাড়ীতে, ঢাকায় এসে মেয়েকে দেখে যেতে আমন্ত্রন জানান। ঢাকায় এসে লায়লাকে জেলে ভগ্ন স্বাস্থে দেখে, তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ভারতে ফিরে যাবার কাগজ পত্রের জটিলতার জন্য, তারা লায়লাকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারে নাই। ব্যথাতুর হৃদয়ে তাদেরকে ফিরে আসতে হোল ভারতে।

দুমাস পড়ে লাইলাকে স্থানান্তরিত করা হয় কুষ্টিয়া জেলে। সেখানে চারদিন রাখার পর, তার দেহে এবং পোষাকে সিলমোহরের ছাপ মেড়ে বনগাঁও সীমান্তে এনে পুলিশ লায়লাকে বাংলাদেশ ছাড়ার হুকুম প্রদান করে। সারা রাত ভর মুষলধারার বৃষ্টিতে, অজানা পথ পাড়ি দিতে থাকে মুক্ত লায়লা। দশ কিলোমিটার হাটার পড়ে, দুটো ট্রেন পাল্টে, একটি ট্রাকে চেপে একদিন প্রত্যুষে লায়লা বেগম সাত বছর পরে এসে হাজির হয়, শূণ্যহাতে, স্বামী ও একমাত্র কন্যা সন্তানকে হারিয়ে, তাদের গ্রাম দয়ানগরে।

এর পরে লায়লা মা'র সাথে বেলডাংগা থানায় এসে অভিযোগ দেয়ার চেষ্টা করে। তার স্বামী এবং শিশুকন্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করে। পুলিশ সব শুনে, তিন দেশ - ব্যাপি যে ঘটনা ঘটেছে, তা সমাধান করার কোন উপায়ই খুঁজে পেল না।

লায়লা তার স্বামীর সন্ধান জানে না, সে শুধু তার শিশু কন্যাটির সন্ধান জানে, কিন্তু কোন্ আইনে তাকে খুঁজে ফিরে পাবে, তার সমাধান কেউ দিতে পারে না। মাত্র ২০ বছরের যুবতী লায়লা মুর্শিদাবাদের নদীর তীরে শুধু হাঁটে একা, হাটতে হাটতে, কোন মানুষ দেখলে, থম্‌কে দাঁড়ায়, জিজ্ঞেস করে, তার কন্যাটিকে তারা দেখেছে কি না ? নদীর স্থির জলে, পড়ন্ত বেলায়, লায়লা, তার প্রিয় স্বামীর মুখ, শিশু কন্যার মুখ দেখতে পায়, লায়লা তাদের সাথে, ফিস্ ফিস্ করে অনেক কথা বলে - এক সময় গোধুলীর, অস্তগামী সূর্য্যটা ডুবে যায় জলে, আর কারুর মুখছবি দেখা যায় না, লায়লা, বুঝতে পারে সবই অলীক, সবই মরিচিকা - সে ডুকরে কেঁদে উঠে। চেয়ে দেখে তার মাও আঁচল চোখে দিয়ে কাঁদছে, লাইলাকে ঘরে নিয়ে যায়। কে জানে কোন কূলে ভিড়বে তার জীবনতরী।

বাবুর্চি

ডেভিড স্বপন রোজারিও

অনেকদিন আগের কথা। আমি তখন ক্লাশ ফাইভের ছাত্র। কালিগঞ্জ বাজার কমিটির পক্ষ থেকে, বিভিন্ন হাটে বাজারে ঢোল পিটিয়ে ঘোষনা দেয়া হলো, এক বিশাল গানের জলসার আয়োজন করা হয়েছে। আমরা বন্ধুরা মিলে সে আসরে গান শুনতে গেলাম। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ আসরকে ঘিরে বসেছেন। চারিদিকে প্রচুর দর্শক সমাগমে আসর গমগম করছে। ঢাকার অনেক নামীদামি শিল্পীরা সে আসরে গান গেয়ে দর্শকশ্রোতাদের মোহমুগ্ধ করে রাখেন। কিন্তু যে গানটির কথা আজও আনন্দ চিত্তে গভীরভাবে স্মরণ করি, তা হলো, এক কিশোরী কণ্ঠের গাওয়া

" যা-রে, যারে উড়ে যা-রে পাখী,
যুরালো প্রানেরও মেলা,
শেষ হয়ে এলো, বেলা,
আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।"

আজও ভুলতে পারিনি সেই মধুমাখা মিষ্টিসুরের গানটি। জলসা শেষে বাড়ী ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। ভরা পূর্ণিমা, চারিদিকে দিনের মতো আলো। নিশুতি রাতে, অখন্ড নিরব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। হঠাৎ সে নিস্তব্ধতা ভেদ করে ঢোলের ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো। শব্দ লক্ষ্য করে একটু এগুতেই, নেশা জড়িত ভগ্নকণ্ঠের গান আমাদের মনোযোগ আকর্ষন করলো। তারা গাইছে

" চুল বাঁধিয়া দেও পিশিমা,
যাই পরের ঘরে,
বয়স আমার পনের - ষোল,
তবে কেন থাকতে বলো।"

অনিল বললো, দাগার মাগো বাড়ীর "জাহাইজ্জা" এসেছেন, সে জন্য এ উৎসব।

সে সময়ে আমাদের রাঙ্গাঁমাটিয়া মিশনে, হাতে গোনা কয়েকজন জাহাজে ও মধ্যপ্রাচ্যে বাবুর্চি কাজ করতেন। যারা জাহাজে কাজ করতেন তাঁদের "জাহাইজ্জা" বলা হতো। এঁদের জীবন নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায়পূর্ণ। দীর্ঘদিন সমুদ্রে ভেসে ভেসে, এঁদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তো। আত্মীয় -পরিজনদের দেখার জন্য মনটা সবসময় ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ করতো। পণ্য বোঝাই জাহাজ, যখন বন্দর থেকে বন্দর ছুটে চলতো, অজানা সব শহর-বন্দর দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। নানা বর্নের মানুষ, ভাষাও ভিন্ন, পোষাকের রিতিনীতিও ভিন্ন। কোন ঘাটে জাহাজ নঙ্গর করলে, মাটি স্পর্শের আনন্দে তাঁরা মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন। আবার দীর্ঘ যাত্রা, নানা বিষাদ, নিত্যদিনের একই দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়তেন। কেবলই মনে হতো কবে শেষ হবে এ সফর, মনবীণায় ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠতো,

"ওরে নীলদরিয়া,
আমায় দে-রে দে ছাড়িয়া,
বন্দী হইয়া মনোয়া পাখী হায়রে,
কান্দে রইয়া রইয়া।"

সে সময়ে, অনেকে সমুদ্র পীড়াগ্রস্থ হয়ে পড়তেন। সারাক্ষণ বিভিন্ন প্রকার রান্না - বান্না নিয়ে ব্যস্ত থেকে সময় পার করে দিতেন। বিভিন্ন শহর-বন্দর থেকে সুন্দর সুন্দর কাপড়-চোপড়, অলংকারাদী, জিনিসপত্র আত্মীয় স্বজনদের জন্য কিনে আনতেন। তাঁদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা যখন, সে সমস্ত কাপড়-চোপড় ও অলংকারাদীতে সুসজ্জিত হয়ে বেড়াতে বের হতেন, তখন সহজেই অনুমান করা যেতো এরা কারা যাচ্ছে।

জাহাজে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে এভারিষ্ট রোজারিও অন্যতম। ছোট খাট শক্ত সামর্থ্য মানুষ, সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জাহাজ সফরের নানা বৈচিত্রময় কাহিনী তন্ময় হয়ে শুনতাম। তিনি এতো সুন্দরভাবে সে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা দিতেন, যেন মনে হতো, সে সমস্ত দৃশ্যাবলী আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। সুদৃশ্য বিশাল জাহাজ, পণ্য বোঝাই করে বন্দর থেকে বন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নানা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর ভান্ডার, থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত। সমুদ্রের সাথে নীল আকাশের নীলাখেলা। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, যেন কুল নেই কিনারাও নেই। রং-বেরং এর মাছের খেলা। বিরাট বিরাট তিমি মাছের অবাধ বিচরণ, ডলফিনের নানা ছুটন্ত দুরন্ত গতি। সী-গালের নিত্য দিনের সঙ্গঁ, বিচিত্র সব দলীয় উদ্ভিদ। সমুদ্রের নীচে ডুবন্ত পাহাড়। সমুদ্রের ভয়ংকর রুপ, কোন কিছুই তাঁর বর্ণনায় বাদ যেত না। তিনি আরও বলতেন, সমুদ্রে সূর্য্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সে মোহনীয় রুপ, সহজে ভোলার নয়। মনে হয় লাল টকটকে প্রকান্ড একটি গোলাকার থালা, সমুদ্রের বুক চিরে অতি নিকট থেকে উদিত হচ্ছে। আবহাওয়া খারাপ হলে, বিশাল ভয়াবহ ঢেউ দেখে তাঁর মনে হয়েছে, বুঝিবা সলিল সমাধি হবে। কিন্তু দক্ষ জাহাজের কাপ্তেন, ঠিকই জাহাজকে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। সমুদ্রের রহস্য সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনীই তিনি বলতেন, যেমন, ভরা জ্যোৎস্নারাতে গভীর সমুদ্রে "মৎস্যকন্যারা" দলবেধে ভেসে উঠতো এবং জলতরঙ্গের সাথে নৃত্য করতো। যে সমুদ্র পরীর উপরিভাগ নারীর মতো ও নিম্নভাগ মাছের মতো তাদের "মৎস্যকন্যা" বলা হয়। অপূর্ব সুন্দরী সে সব মৎস্যকন্যাদের কথা, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনেছি। পুলোকিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি কি কোনদিন স্বচক্ষে তা দেখেছেন ? তিনি অবশ্য বলেছিলেন, " সে সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি, তবে জাহাজের অনেক পুরনো মাঝি মাল-াদের কাছে শুনেছি।" তখন মনেপ্রানে বিশ্বাস করলেও, আজ বিশ্বাস করতে সত্যি কষ্ট হয়। কেবল শোনা কথা যুগযুগ ধরে, একে অপরের কাছে থেকে শুনে আসছে, নাকি বাস্তবে আছে, বলা মুশকিল। সমুদ্রের নেশা বড় নেশা। দীর্ঘদিন বাড়ী বসে থাকতে থাকতে, তাঁরাও একদিন হাঁপিয়ে উঠতেন ও জমানো টাকাও প্রায় ফুরিয়ে যেত। তবে জাহাজীদের অপেক্ষা করতে হতো, কবে আবার "নলি" আসবে। নলির অর্থ হলো পরবর্তী জাহাজে চাকরীর জন্য ডাক বা নিয়োগপত্র। এভাবে একদিন তাঁরা আবার ডাঙ্গাঁর মায়া কাটিয়ে, দীর্ঘ সমুদ্র সফরে বেড়িয়ে পরতেন।

জাহাইজ্জা ছাড়াও, যে কজন মধ্যপ্রাচ্যে বাবুর্চি কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে পেদ্রু রিবেরুর নাম উলে-খযোগ্য। পেদ্রুদা যখন ছুটিতে বাড়ী আসতেন, তখন বাড়ীতে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতো। আত্মীয় - কুটুম্বে বাড়ী ভরপুর হয়ে উঠতো। তিনিই প্রথম আমাদের মিশনে গ্রামাফোন নিয়ে আসেন। যাকে আমরা ছোটবেলা "কলের গান" বলতাম। সারাদিন রেকর্ডে মুকেশ, রফি, লতা, সায়গল, জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত ইত্যাদি জনপ্রিয় শিল্পীদের গান বাজতো। আশে-পাশের কোথাও গ্রামাফোনের চল ছিলনা। পাড়ার অনেকে অবাক বিস্ময়ে, সে গানের মানে না বুঝলে, সঙ্গীতের ঝংকারে মন মাতানো গানগুলো, মুগ্ধ হয়ে শুনতো। বিশেষ করে মোঃ রফির সারা জাগানো গান,

" ও দুনিয়া কি রাখওয়ালে,
সুন দরদভরে মেরে নালে।"

দরদমাখানো গানটি আজও কান পেতে শুনতে ইচ্ছা করে। এ ছাড়াও ক্যামেরা, রেডিও সহ নানা সৌখিন জিনিষও তিনি আনতেন, যা সে সময়ে দুস্প্রাপ্য মনে হতো।

আমার দেখা, উক্ত দুজন ব্যক্তি একই পেশায় নিয়োজিত থেকে, ব্যতিক্রমধর্মী দুটি ক্ষেত্রে কাজ করে, যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ভোগ করেছেন, তা সত্যিই প্রশংস-নীয়। পেদ্রুদা মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে যে সম্পদ গড়ে তোলেন, সেক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক বন্ধুরা শহরে চাকরি করে, সংসার চালাতে অনেক সময় হিমশিম খেয়ে যেতেন। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথাই তিনি বলতেন। তিনি সাহেবদের সাথে অনেক দেশে ঘুরেছেন। অনেকে তাঁর রান্নার প্রচুর প্রশংসা ও করেছেন।

আমার এক তালইমশাই সেলেষ্টিন কোড়াইয়া, গুলশানে বিদেশী সাহেবের ঘরে বাবুর্চির কাজ করতেন। ছুটিতে বাড়ী এলে তাঁর মুখে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনতাম। উনি নানা উপদেয় খাদ্য তৈরী করে সকলের সুনাম অর্জন করেন। ভালো বাবুর্চি হিসেবে সকল সুযোগ সুবিধা ও সন্মান তাঁর ছিল। দীর্ঘদিন তিনি সে চাকরি করেন এবং আজও তাঁর অবসর জীবনে কোন বড় পার্টি হলে, গ্রাম থেকে খবর দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানের জন্য। আজও বড় বড় হোটেলে এমন অনেক খ্রীষ্টান বাবুর্চি বা সেফ্ আছেন, যাঁরা প্রথাগতভাবে শিক্ষিত না হয়েও, শুধুমাত্র মেধা, অভিজ্ঞতা, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠাকে পূঁজি করে, উক্ত পেশায় শীর্ষস্থান গ্রহনে নিজেদেরকে যোগ্যতম করে তুলেছেন। এমনই অনেকে স্বল্প শিক্ষিত, তদুপরি কোন প্রতিষ্ঠিত ক্যাটারিং স্কুল থেকে ট্রেনিং না নিয়ে, শুধুমাত্র লব্ধ অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টি সুখের উল-াসে কেক্ ও সালাদের উপর নানা নকশা একে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। এমনকি তাঁদের প্রণীত নানা রেসিপি, সহজে কেউ উপেক্ষা করতে পারতেন না। হয়ত অনেকে ইংরেজী ভালমত পড়তে বা লিখতে পারেন না, কিন্তু শুনে শুনে শিখে অনর্গল ভাবে ইংরেজীতে কথা বলে যাচ্ছেন।

তখন পেশা সম্বন্ধে চিন্তা করার মতো বয়স আমাদের হয়নি। কিন্তু তাদের দেখে ঠিকই বুঝেছিলাম, তারা যে চাকরিই করেননা কেন, আর্থীকভাবে তাঁরা স্বচ্ছল। পরবর্তীতে অবশ্য দেখেছি, আমাদের শিক্ষিত সমাজে, বেয়ারা - বাবুর্চি পেশাকে স্বীকৃতি না দিয়ে, বরং খুবই হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। আমাদের সময়ে যাঁরা মোটামুটি শিক্ষিত ছিলেন, এমনই মনভাব ছিল যে, না খেয়ে মরে যাবে, তবুও বেয়ারা বাবুর্চি কাজ করবে না। অনেকে আবার বেয়ারা - বাবুর্চির কাছে, সহজে মেয়ে বিয়ে দিতে চাইতো না। আমাদের রাঙ্গামাটিয়া মিশনে যেখানে বহুপূর্বে, হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র জাহাজে ও মধ্যপ্রাচ্যে বাবুর্চি কাজ করতেন, আজ সেখানে এমন খুব কম বাড়ীই আছে, যে বাড়ীর কেউ না কেউ মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেয়ারা - বাবুর্চিসহ, নানা পেশায় নিয়োজিত আছেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাধীনতার পর, এনজিওগুলো আমাদের খ্রীষ্টান ছেলে-মেয়েদের চাকরির সুযোগ করে না দিলে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো, ভাবতেও গা শিহরিয়ে উঠে। এ ক্ষেত্রে "কারিতাস ও ওয়ালর্ড ভিশন" মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বাবুর্চি পেশাকে আগে যারা অবজ্ঞা করতো, তাদের জ্ঞাতার্থে শুধু এটুকু বলা যায়, আজ সারা বিশ্বে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাবুর্চি কাজই অত্যন্ত সহজলভ্য যাদের চাকরির অভাব খুবই কম। হায় হুতাশ করে ঘরে বসে থাকতে হয়না, কোন না কোন ভাবে কাজ জুটে যায়। যদিও বা পাশাপাশি অনভিজ্ঞ - অদক্ষ লোকদের, ইউরোপ - আমেরিকা ও কানাডার মতো দেশে করতে চাইলে, "অড জবের" তেমন একটা অভাব নেই। তবে যাঁরা নিজ দেশে ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি সন্মানজনক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, উক্ত দেশে তাঁদের নিজ পেশায়

চাকরি পেতে অনেক বেগ পেতে হয়। নতুন করে আবার পড়াশুনা করে সার্টিফিকেট নিলে, হয়তো বা কাংখিত চাকরিটি পেতেও পারেন। সুখের বিষয়, পাশ্চাত্য দেশে শ্রমের মর্যাদা আছে, ফলে কেউ কারো পেশা সম্পর্কে সহজে প্রশ্ন করেনা। অনেকেই ফেক্টরীর শ্রমিক, গাড়ী চালক বা অড জব করেন, তা সবাই মোটামুটি জানেন যদিও তাঁরা শিক্ষিত।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাবুর্চি পেশায় নিয়োজিত বাঙ্গাঁলী খ্রীষ্টানরা বহুপূর্বে, বিশেষ করে আমেরিকার মতো দেশে, চাকরির সুবাদে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। এ জন্য অবশ্যই তাঁরা গর্বিত ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। পরবর্তীতে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, বিপুল সংখ্যক খ্রীষ্টভক্তগণ এ দেশে আসার সুযোগ পেয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সে সংখ্যা শাখা - প্রশাখা মেলে, আজ অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে চলেছে। মূলত বৃটিশ শাসনামলের গোড়া থেকেই, বাঙ্গাঁলী খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন কারণে এ পেশার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এ পেশা তাদের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরনে সক্ষম ছিল। প্রথমে এ পেশায় স্বল্প শিক্ষিত লোকজন বেশী যোগ দিতেন। কিন্তু বর্তমানে, এ পেশার যোগ্যতা বা মর্যাদার মাপকাঠি অনেক উর্দ্ধে। প্রাশ্চাত্ত্য দেশগুলো, এ পেশাকে বহুগুনে উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত করে তুলেছেন। আগে অনেকে দেখে দেখে কাজ শিখেছেন এবং নান-াভাবে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে, রন্ধন পদ্ধতিতে উলে-খযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ করে তুলেছিলেন। তাদের অনেকেই এদেশে বড় - ছোট ও মাঝারি ধরনের হোটেল, রেস্তোরা, ক্লাব, ক্যাটারিং কোম্পানী ও নানা ফুড প্রসেস কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছেন। আজ আর সেদিন নেই, ভালো বাবুর্চি হতে হলে প্রাথমিকভাবে যে যোগ্যতা প্রয়োজন, তা হচ্ছে অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। যে কোন ক্যাটারিং স্কুল বা কলেজ থেকে সংশি-ষ্ট বিষয়ে ডিপে-মা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি, পাশ্চাত্ত্য দেশে, খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা, ফ্রীজার, ভেন্টিলেটর, কোলড্ স্টোরেজ, সাধারন স্টোরেজ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এছাড়াও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হয়, যাতে করে বাবুর্চিগণ সেগুলো উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

প্রবাদ বাক্য আছে, "অতি বড় রাধুনী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।"

উত্তম রান্নার কিন্তু অনেকগুন, খোঁজ পরে যায় রাঁধুণী বা বাবুর্চির, সকলে প্রচুর প্রশংসা করেন এবং মুখে মুখে তাদের নাম ছড়িয়ে পরে চারিদিকে। অপরদিকে বাজে রান্নারও অনেক দুর্নাম রটে। অনেকে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে ধর্মগুরু বা গুরুজনদের আপ্যায়িত করে আত্মসুখ অনুভব করে। তাঁরারও তৃপ্ত হয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। আদিকাল থেকেই মানুষ কিন্তু, খেয়ে তৃপ্ত। আর সে বিষয়ে ছোট একটি ঘটনা উলে-খ করে, লেখাটি শেষ করছি।

পবিত্র বাইবেলে আদিপুস্তক ২৭ অধ্যায় উলে-খ আছে যে, ইসহাক বৃদ্ধ হলে পর তাঁর চক্ষু নিস্তেজ হয়ে যায়, ফলে তিনি আর দেখতে পেতেন না, তখন তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডেকে বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কোনদিন আমার মৃত্যু হয় জানিনা। বিণয় করি, তোমার শস্ত্র, তোমার তূণ ও ধনুক নিয়ে প্রান্তরে যাও, আমার জন্য মৃগ শিকার করে আন। আর আমি যেরূপ ভালবাসি, তদ্রুপ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে আমার নিকট আন, আমি ভোজন করব, যেন মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে।

পিতা-পুত্রের কথোপকথন ইসহাকের স্ত্রী রেবেকা শুনেছিলেন। রেবেকা আপন পুত্র যাকোবকে বললেন, তুমি পালে গিয়ে উত্তম দুটো ছাগ বৎস নিয়ে এস, তোমার পিতা যেরূপ ভালবাসেন, তদ্রুপ সুস্বাদু খাদ্য আমি প্রস্তুত করে দিচ্ছি। যাকোব মাতাকে বললেন, দেখ আমার ভ্রাতা এষৌ লোমশ, কিন্তু আমি নির্লোম, কি জানি পিতা আমাকে স্পর্শ করবেন, আর আমি তাঁর দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক বলে গন্য হব, তাহলে আমার প্রতি আশীর্বাদ না বর্ত্তিয়ে অভিশাপ বর্ত্তাবে। মাতা বললেন, বৎস, সে অভিশাপ আমার উপর বর্তুক, তুমি কেবল আমার কথা শোন। যাকোব গিয়ে দুটো ছাগ মাতার নিকট নিয়ে এলেন। তাঁর পিতা যেরূপ ভালবাসেন, মাতা সেরূপ খাদ্য প্রস্তুত করলেন। ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর যে মনোহর বস্ত্র ছিল, তা নিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে পরিয়ে দিলেন, আর দু-ছাগ বৎসের চর্ম নিয়ে তাঁর হস্ত ও গলদেশে নির্লোম স্থানে জড়িয়ে দিলেন। যাকোব আপন পিতা ইসহাকের নিকট গেলে তিনি তাকে স্পর্শ করে বললেন, স্বরতো যাকোবের কিন্তু হস্ত এষৌর হস্ত। বাস্তবিক তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। ইসহাক বললেন, আমার কাছে আন, আমি পুত্রের আনিত মৃগমাংস ভোজন করি, যেন আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে। তখন তিনি মাংস ও দ্রাক্ষারস এনে দিলেন, ইসহাক ভোজন ও তা পান করলেন। পরে বললেন, বৎস বিণয় করি আমার নিকটে এসে আমাকে চুম্বন কর। যাকোব তাঁর নিকটে গিয়ে চুম্বন করলেন, ইসহাক তার বস্ত্রের গন্ধ নিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, - " দেখ, আমার পুত্রের সুগন্ধ, সদাপ্র-ভুর আশীর্বাদযুক্ত ক্ষেত্রের সুগন্ধের ন্যায়। ঈশ্বর আকাশের শিশির হতে ও ভূমির সরসতা হতে তোমাকে প্রচুর শস্য ও দ্রাক্ষারস দিন।

লোকবৃন্দ তোমার দাস হোক, জাতিগণ তোমার কাছে প্রানপাত করুক, তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্তা হও, তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রানপাত করুক। যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দেয় সে অভিশপ্ত হোক, যে কেহ তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশীর্বাদযুক্ত হোক। আর ঠিক এভাবে যাকোব ছলপূর্ব্বক পিতার আশীর্বাদ লন।

বঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মের আগমন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - ভুষণার রাজপুত্র আন্তোনিয়ো

জুলিয়ান গমেজ, ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক সংগ্রহে - বেঞ্জামিন রোজারিও, বেয়ন, নিউজার্সি

বাংলাদেশের সঙ্গে মিশনারীদের যোগাযোগের কথা এখানেই শেষ নয়। এবার এমন একজন লোকের কথা আমরা আলোচনা করবো যার জীবন চরিত্রের সঙ্গে বাঙালী খ্রীষ্টিয় সমাজ অবিচ্ছেদভাবে জড়িত। প্রথম দিকে বাংলা দেশের মিশনারীরা ছিলেন বিদেশী কিন্তু সপ্তদশ শতকে একজন বাঙালী হিন্দু সন্তান ধর্মান্তরিত হয়ে মিশনারীদের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। এই বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন ভুষণার রাজ্যের রাজপুত্র - দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো। নামটি শুনলে নিশ্চয়ই তাঁকেও বিদেশী মনে হবে। কিন্তু আসলে তা নয়। বিখ্যাত বার ভূঁইয়ারই অন্যতম ছিলেন ভূষণ রাজা। বর্তমানে ফরিদপুর শহর হইতে ২১ মাইল দক্ষিণ - পশ্চিমে ভূষণা নামে ছোট শহরটি আজও আছে। সেই রাজ্যের রাজপুত্র ছিলেন এই আন্তোনিয়ো। দুঃখের বিষয়, তাঁর পিতৃদত্ত নাম আজ জানবার উপায় নেই। এমন কি তাঁর বংশতালিকাটি ও উদ্ধার করা কঠিন। এইটুকুমাত্র বলা যায় যে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মন সন্তান।'

ইসলাম খাঁ যখন বাঙলার শাসন কর্তা সত্যজিৎ রায় তখন ছিলেন ভূষনার রাজা। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিগত হন। তাঁর মৃত্যুর পর সংগ্রাম সিংহ ভূষণার জায়গার আবিষ্কার করেন। ইন্ডি মগদের উপদ্রপ দমন করতে আপ্রান চেষ্টা করেন। তাঁর ছেলের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে ভূষনার জায়গার খোজ হয়। পরে প্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় এখানের জমিদারী পেয়েছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সত্যজিৎ রায় এবং সংগ্রামসিংহের বংশের লোকেরা ভূষণার রাজা উপাধি ধারণ করেন। আন্তোনিয়ো কোন্ পরিবার ভুক্ত ছিলেন বলা যায় না, এবং ঐ দুইটি পরিবার ছাড়া অন্যকোনও বংশ ভূষণার রাজা উপাধি ধারণ করেছিল কিনা তা-ও বলা যায় না। রাজা সীতারামের সঙ্গে আন্তোনিয়ো কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তা-ও বলা যায় না।

১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগ দস্যুরা রাজকুমারকে বন্দী করে কোন পর্তুগীজ কাপ্তেনের কাছে বিক্রয় করে। কালো বেঁটে এবং রুগ্ন হলেও ছেলেটিকে খুব গুনসম্পন্ন দেখে তারা তাকে কোনরকম কষ্টভোগ করতে না দিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দে লালন পালন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ছেলেটি তাদের দেওয়া কোন খাবার খেতে রাজী হয় না। কাপ্তেন তখন তাকে ফাদার রোজারিও নামে একজন পাদ্রীর তত্ত্বধানেস স্থল পথে চট্টগ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। পাদ্রী রোজারিও তাকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই সে ধর্মকথা শুনবে না। অবশেষে হতাশ হয়ে ফাদার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। গভীর রাত। হঠাৎ ছেলেটির কান্না শুনে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তারা এসে দেখে দারুণ ভয়ে ছেলেটি কাঁপছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে সে বললো ঐ পাদ্রী মহাশয় (সাধু আন্তোনির ছবি দেখিয়ে) আমাকে মেরেছেন, খেতে বলছেন ও খ্রীষ্টান হতে আদেশ করছেন। সকলে তখন জানু পেতে বসে সাধু আন্তোনিকে তাঁর অলৌকিক কাজের জন্য কৃতজ্ঞাতা জানালেন। ছেলেটি তাঁর কাছে নিদর্শন চাইল তাঁর গলায় একটা ক্রশ চিহ্ন এঁকে দিন। তাঁর মৃত্যু অবধি চিহ্নটা বিদ্যমান ছিলো। পর দিন সে দীক্ষা নেয় এবং তাঁর নাম রাখা হয় আন্তোনিয়ো। তাঁর দীক্ষাদাতা রোজারিও'র অনুযায়ী তাঁর পদবী হলো দো রোজারিও। আর তাঁর উচ্চবংশ এবং রাজপুত্রের নিদর্শন স্বরুপ তাঁর নামের আগে দোম কথাটি ও ব্যবহার করা হতো । অল্প বয়সেই তিনি পর্তুগীজ ভাষা লিখতে ও পড়তে শিক্ষা করেন এবং ভালভাবে খ্রীষ্টধর্ম অধ্যয়ন করেন।

তেইস বৎসর বয়সে কয়েকজন পরিচিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি চট্রগ্রামে থেকে নিজগ্রামে ফিরে আসেন এবং ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁরই গোত্রের এক মেয়েকে দীক্ষা দিয়ে তিনি বিবাহ করেন এবং আত্মীয় স্বজনদের ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষন করেন। তাঁর পিতার জমিদারীর মধ্যে পেচ্ছভাঙ্গা নামক স্থানেই তিনি প্রথম প্রচার শুরু করেন। তিনি প্রকাশ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সমালোচনা করেন।

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই ধর্মকথা নিয়ে বাদ বিতন্ডা হতো। এই প্রসঙ্গে উলে-খ করা উচিত, যা তাঁর জীবন কাহিনীতে বহু অলৌকিক ঘটনার কথা পাওয়া যায়। একবার ব্রাহ্মনরা কুহক প্রভাবে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করে । কিন্তু তাদের সে অভিসন্ধি সফল হয়নি। আর একবার ব্রাহ্মনরা বললেন যে অগ্নিদেবের সাহায্যে তাঁদের তর্কের মীমাংসা করা হোক। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রগ্রন্থটি পুড়ে ছাই হয়ে গেলো আর আন্তোনিয়োর পুস্তকটি আগুন স্পর্শ করলো না। তাই দেখে হিন্দুদের তো কথাই নাই, অনেক মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লো। এর আগে মুসলমানরা বোধ হয় খ্রীষ্টধর্মকে প্রকাশ্যে গ্রহন করেনি। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন হুগলীতে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তখন এক তাঁতী তাঁকে বাজীকর বলে উপহাস করে, কিন্তু সেই রাত্রে তার ঘরের সামনে খ্রীষ্টের দর্শন পেয়ে তাঁতী জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এই সমস্ত ঘটনার ঐতিহাসিকতা অবশ্য প্রশ্নের বিষয়। আন্তোনিয়া সম্পর্কে সমসাময়িক লেখকেরাও সকলে একমত নন। ফাদারের লেখা চিঠিপত্র দেখে মনে হয় ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর আন্তোনিয়া ধর্ম কর্মে কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়েন। তাই প্রশ্ন উঠে আন্তোনিয়ার সঙ্গে জড়িত অলৌকিক কাজের কথাগুলো নির্বিচারে মেনে নেওয়া চলে কি - না।

যাই হোক, তার চেষ্ঠায় বহুলোক যে খ্রীষ্টান হইয়াছিলো তা বিশ্বাস না করে উপায় নাই। তিনি মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মপ্রচার করেন। এতে ঢাকার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ ক্রুদ্ধ হয়ে নতুন খ্রীষ্টানদের নিপীড়ন করতে থাকেন, কিন্তু নির্যাতনের মধ্যেও তাদের অটল বিশ্বাস দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং বন্দীদের মুক্তি বিধান করেন। আন্তোনিয়াকে ভুষনার চারখানা গ্রামও দান করেন। গ্রামগুলিতে খ্রীষ্টানরা বসবাস করতে থাকে। চৌধুরী বা জমিদার হয়েও তিনি গরীব ছিলেন। তাঁকে একশ' টাকা কর দিতে হইত, তা তিনি দিতে পারতেন না বলে শ্বাসনকর্তার কর্মচারীরা তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত করতো। ঠিক এই সময় ঢাকার কাছাকাছি কোন অঞ্চলে ৫০/৬০ ঘর খ্রীষ্টান বাস করতো। জায়গাটার মালিক ছিল মুসলমান। তিনি ধর্মের জন্যে তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু কর আদায় করতেন। তবে মোটা মোটি বিচারে বলতে গেলে বলা যায়, সেকালের মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের বেশ সুনজরেই দেখতো। তারা খ্রীষ্টানদের প্রশংসাও করতো আবার ভয়ও করতো - বিশেষ করে পর্তুগীজদের। এ বিষয়ে একটা গল্প আছে। একবার নবাব মূর্শিদকুলী খাঁ কয়েকজন খ্রীষ্টানকে কর না দেওয়ার জন্য বন্দী করেন এবং বাংলাদেশের গির্জাগুলো ভেঙ্গে ফেলবার আদেশ দেন। কিন্তু তাঁর এক প্রতিপত্তিশালী জামাতা এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, কি করছেন জাঁহাপনা ? আপনি মালিক, আপনার যা খুশী তা-ই করতে পারেন। কিন্তু আদেশ মত কাজ করা হলে মক্কা শহরের অবস্থা কি হবে।"

কেন ? প্রশ্ন করলেন নবাব।

"পর্তুগীজরা যখন শুনবে আপনি ওদের গির্জা ভেঙ্গে ফেলেছেন, তারা তখনি মক্কায় গিয়ে হজরত মুহম্মদের কবর ও মসজিদ ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে।" "তারা কেমন করে সেখানে যেতে পারবে ? আর তারাকি আদৌ সেখানে যেতে সমর্থ হবে।" নবাবের উদ্ধত প্রশ্ন।

"হাঁ জাহাপনা তারা ওটুকু অনায়াসে পারবে। আর-বাংলাদেশেও আপনি খুব নিরাপদ নন। আপনি জানেন না পর্তুগীজরা কি সাংঘাতিক লোক। আমি গোয়াতে ছিলাম কিছুদিন, তাই আমি ওদের কিছুটা চিনি - ওদের ছেড়ে দিলেই ভালো করবেন।

নবাব তখনই তাঁর আদেশ রহিত করলেন এবং বন্দীদেরও মুক্তি দিলেন।

আন্তোনিয়োর কার্য্যকলাপের কথা চারিদিকে খ্রীষ্টান মহলে এক উত্তেজনা এনে দিলো । আগ্রা থেকে ফাদার মাগালহেস (Magalhais) এলেন স্বচক্ষে তাঁর কার্য্যকলাপ দেখার জন্য। প্রথম কথাবার্তাতেই বুঝলেন আন্তোনিয়ো ভগবানেরই কাজ করছেন। তারপর তিনি আন্তোনিয়োকে অনুরোধ করলেন নূতন ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের দেখাতে। এই ফাদারের লেখা চিঠি থেকে সেকালের অনেক নূতন বসতি স্থানের কথা জানা যায়। নীচে এই গ্রামগুলির নাম ও খ্রীষ্টানদের সংখ্যা তুলে ধরেছি।

আফিমপুর = ৫০০ ঘর। জসেডি = ২০০ ঘর। সেরথ, দাপা, গেদারপুর, কদমতলী, পঙ্গা =৪০০ অধিক লোক। সোরাহি = ২০০ ঘর। দিউরা = ৩০০ ঘর। আত্তাবো = ৬ ঘর। করদোঠম্‌বো = ৩৮ ঘর। রইলা, বেলাদির, আন্দিয়া, কারাতিয়া, মিরবো = ১৩৬ ঘর। জোম = ৫ঘর,সাফন = ১০০ ঘর। বান্দাপেলা = ১০ ঘর। বদরতি = ৩০ ঘর। বরনা = ৪ ঘর। পেইর = ২০ ঘর। ফোরান = ১০ ঘর। ওতোরকাল = ৭ ঘর। পোসী = ৪০ ঘর। মসিমপুর = ১০ ঘর। কুমুতকলা = ২০ ঘর। মনছিপুর = ১০ ঘর। মছিমপুর = ১৬ ঘর। সাগদি = ৪০০ ঘর। মাসদিয়া = ৮০০ ঘর। করিসে = ৪০০ ঘর। আলজো = ৫ ঘর। শিরোত ও আশেপাশের গ্রামে = ৫০০ ঘর। আগাকাসতোল = ৩৫ ঘর। বালদাকান = ৫ ঘর। মসুয়াকাশ = ৭০০ ঘর। সোরারগান = ৫০০ ঘর। চাঁদপুর চিতুলিয়া = ৪০ ঘর। সাবাপুর = ৮০ ঘর। সোনগান = ২৫ ঘর। বুলিকা = ৪৫ ঘর। মিসোলিয়া = ৪০ ঘর। পেবক্রদি = ২০ ঘর। বামনদি = ২০ ঘর। গায়দিয়া = ৮ ঘর। আতারৌকানিয়া = ২০ ঘর। বান্দোসমা = ৩০ ঘর। গোমারিয়া = ৪০ ঘর। পানদিয়া = ৪৫ ঘর। আগারাজন্দা = ১০ ঘর। দোগদাগা = ৮০ ঘর। সারোয়া = ১৮০ ঘর। সোনাতিয়া = ১৮০ ঘর।উষাভলো (ভাওয়াল), বামপুর, মির্জারপুর, মজদিয়া, দানিল, মাসিদিয়া, সাউরাল = ৪০০ ঘর।

গোরাঘাট = ১৮০ জন লোক, বোরোইতলা =১,৪০০ জন লোক, রাঙ্গামাটি = ৯০০ জন লোক।

মাননীয় ফাদার স্বাভাবিকভাবেই নামগুলো একটু বিকৃত করে ফেলেছেন যার ফলে বিভিন্ন স্থানগুলিকে ঠিকমত চেনা যায় না। ঐ গ্রামগুলি বর্তমানে কি নামে চলছে তা'বলা কঠিন। শুধু এইটুকু বলা যায় নিঃসন্দেহে যে গ্রামগুলি ছিলো ঢাকার কাছাকাছি এবং নদীর ধারে। কারন আন্তোনিয়োর সঙ্গে বার হবার আগে তিনি লড়িফুল এবং চাঁদপুরেও গিয়েছিলেন - সেখান থেকে তাঁরা নৌকা করে বেড়াতে থাকেন।

এ সমস্ত গ্রাম ছাড়া আরও অনেক জায়গা ছিলো যেখানে যাবার সময় ছিলো না বলে তাঁর যাওয়া হয়নি। সুতরাং সমস্ত জায়গার হিসাব আমরা পাই না। তবে সবচেয়ে বড় কথা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী লোক খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ঠ হলো। এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে কিনা ?

মাতৃভাষায় প্রচার করে তিনি বিশেষভাবে কৃতকার্য হইয়াছিলেন এ কথা সত্য কিন্তু ফাদারদের লেখা চিঠিপত্র দেখে মনে হয় রাজনৈতিক কারনেও হয়তো কিছুলোক আন্তোনিয়োকে অনুসরণ করে থাকতে পারে।

আন্তোনিয়োর খ্রীষ্টানরা হয়তো মনে করতো যে পর্তুগীজ মিশনারীরা তাদের অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে বাঁচাবে - এই বিশ্বাস হয়তো পূর্ববঙ্গের অনেক অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এমনও হতে পারে যে আন্তোনিয়ো যখন ধর্মরাজ্যের কথা বলতেন সাধারন লোকে তখন মনে করতো তিনি শাসনকর্তাদের বিতাড়িত করার কথা বলছেন। আবার এমনও হতে পারে যে আন্তোনিয়ো সত্য সত্যই একটা রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে কোন উৎপীড়ন, অবিচার বা অত্যাচার থাকবে না । এ বিষয়ে জোরের সাথে কিছুই বলা যায় না কারণ এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য খুব একটা নেই।

নূতন খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা পূর্বে মুসলমান ছিলেন তারাই হয়ে উঠলো বেশী ধর্মভীরু। এ সমস্ত গ্রাম্য মুসলমানরা শহরের সঙ্গে কোনই যোগাযোগ রাখতো না এবং ইসলাম ধর্মেরও বিশেষ কিছুই বুঝতো না। এরা ফাদারদের কথা ও উপদেশ ভক্তি সহকারে মেনে চলতো। খ্রীষ্টান হবার পর তাদের গুপ্তভাবে থাকতে হতো। কারন সম্রাট ঔরঙ্গজের তাদের ধর্মত্যাগ অনুমোদন করেননি। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক পূর্বে হিন্দু ছিল এবং তারা অনেকসময় আধ্যাত্মিক কারনে ধর্মত্যাগ করেনি। তারা জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলো এবং কোন কারনে জাত হারিয়ে ফেলে সময় সময় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহন করতো। কিন্তু খ্রীষ্টান হয়েও তারা তাদের সংস্কার একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারত না, তারা ব্রাহ্মনদের মেনে চলতেন এবং বিভিন্ন বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতো। আন্তোনিয়ো তাদের এভাবে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।

- ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ

রাজকুমারের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই গ্রন্থ। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যের রচনা করার কৃতিত্বের অংশীদার। তাঁর আগে গদ্যে এই রকম একটা গোটা বই কেউ রচনা করেননি - করলেও তাঁর পুঁথি এখনো আবিষ্কার করা হয়নি। আন্তোনিয়োর বইটির ভাষা সরল, দুই একটা সংস্কৃত শে-াক ও আছে এবং সেই যুগের কথা বলার ভাষাকে প্রধানভাবে নেওয়া হয়েছে। বইখানি হাতে লেখা ছিলো, তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপানোর জন্য লিসবনে পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু তা ছাপা হয়েছিলো কিনা অবশ্য জানা যায় না। তিনি লিখেছিলেন বাংলায় কিন্তু ফাদারেরা নিজেদের সুবিধার জন্য রোমান হরফে তা নকল করেন। বইটির রচনা কাল সম্ভবত ঃ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোন একটা সময়।

একজন ব্রাহ্মন ও একজন রোমান ক্যাথলিকের কথাবার্তার মাধ্যমে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমান করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন অবতারগন পরম পবিত্র ভগবান হবার উপযুক্ত নন। তবে সুক্ষভাবে দেখলে মনে হয় হিন্দু শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান হয়তো তাঁর ছিলো না। রামায়ন, মহাভারত এবং পুরান হতে যে সব কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে তাতে অনেক ভুল দেখা যায় এবং বেশীর ভাগ স্থলেই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন তিনি। তিনি বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা বলেছেন, মৎস্য, বূর্ম, বরহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বলরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও কল্কী। সংখ্যা ঠিক আছে কিন্তু তার তালিকায় জয়দেবের তালিকার মত বুদ্ধের উলে-খ নাই। উলে-খ আছে কৃপের রুপ কোন অবতার ন'ন তবে "সকৃপ" যে বুদ্ধ তা হয়তো তিনি জানতেন না। অন্যত্র বলেছেন, ঊষাহরনে বিষ্ণু কৃষ্ণে নাতি অনিরুদ্ধকে বাঁচাইলেন রাজার সবংশ বধ করিয়া। তিনি বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে পৃথক মনে করেছেন। কৃষ্ণ পরাস্ত করে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করেছিলেন। এখানে বিষ্ণু এলেন কি করে।

অনেকে এমনও মন্তব্য করেছেন যে বইটা সত্য সত্য আন্তোনিয়োর রচিত নয়। অন্যান্য জেসুইট ফাদারেরা লিখেছেন যা পরে আন্তোনিয়োর নামে চলে আসে। কিন্তু এটা যে একজন বাঙ্গালীর লেখা তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবত জেসুইট ফাদারেরা তাঁর বইটার কথা জানতেন না বা তাঁদের মনঃপুত না হওয়ায় তাঁরা এটার কোন উলে-খ করেননি।

আন্তোনিয়ো পূর্ববঙ্গের লোক, তাঁর লেখার মধ্যেও তা প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত বহুশব্দ ও প্রবাদ তিনি ব্যবহার করেছেন। যা থেকে প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার অবকাশ পাওয়া যায় যেমন ঃ-

যুর্দো (যুদ্ধ) / কান্দিলেন (কাঁদিলেন) / আঁসা (হাসা)
লঙ্কাথাকা (লঙ্কা হ'তে) / জর্ম (জন্ম) / রাদা (রাধা) ছাওয়াল (ছেলে) / রাইত্রে (রাত্রে) / নীলা (লীলা) ইত্যাদি।

পাঠক পাঠিকাদের কাছে ভালো লাগবে মনে করে বইটির আরম্ভ থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি ঃ-

" ব্রাহ্মন ঃ- তুমি কারে ভজো ?
রোমান কাথলিক ঃ- পরমেশ্বর পূর্ন ব্রমেরে।
ব্রাহ্মন ঃ- তবে তোমরা বরো উত্তম ভজোনা ভজো, আমরা তাহারে ভজি ?
কাথলিক ঃ- যদি তোমরা সেই পূর্ণ ব্রমেরে অধর্মো ভজন দেখি ?
ব্রাহ্মন ঃ- তুমি এত পিয়ামোন্ডো হইয়া আমাদিগের পরমেশ্বরের নিন্দা করছ ? এহাতে তোমার শাস্ত্রে অপারনিমান (অপরিনাম) নাহি ?
কাথলিক ঃ- আমারগোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, যে জনে ধর্মো নিন্দা করে, সে মহা নারোকী এবং যেজন অধর্মেরে ধর্মো বলে সে মহা নারোকী।
ব্রাহ্মন ঃ- তবে তো তোমারদিগের শাস্ত্রে - - নিন্দা করিলে মহানারোকী হন তবে কেনো নিন্দা করিলা ?

গোড়াতেই দেখা যায় আন্তোনিয়ো যুক্তির সাহায্যে ব্রাহ্মন বক্তার মতবাদ সমালোচনা করিতে চলেছেন, কিন্তু অনেকস্থলে সরল যুক্তি ব্যবহার করেননি - কৃষ্ণ চরিত্রের ব্যাখ্যা তার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। সম্ভবত ঃ সেকালের অশিক্ষিত পাঠকদের জন্য অত্যন্ত সরলভাবে কয়েকটা কথার মাধ্যমে ধর্মালোচনা করেছেন - গভীরভাবে খ্রীষ্টধর্মও আলোচনা করা হয়নি। তাঁর বইটা নাগরীর ফাদারেরা যত্ন সহকারে বহুকাল রেখেছিলেন। সম্ভবত ঃ শাস্ত্র আলোচনার সময় তাঁরা এটা ব্যবহার করতেন। তাঁদের যত্নের ফলে আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীনতম পুঁথি দেখতে সমর্থ হচ্ছি। এ বিচার তাঁদের কাছে ঋণী।

আন্তোনিয়োর মৃত্যুর সন - তারিখ জানা যায় না। যতদূর মনে হয় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে কাছাকাছি এক সময় তিনি দেহত্যাগ করেন । অন্যান্য প্রচারকেরা এত কাল তাঁর পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে কোষাভাঙ্গায় বাস করতেন। কোষাভাঙ্গা ঢাকা এবং হুগলীর মাঝামাঝি কোন একস্থানে অবস্থিত ছিলো। এখানে খ্রীষ্টানদের উপর নানা উপদ্রব হওয়ায় ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার আঞ্জস (Luis dos Anjos) ভাওয়াল পরগমার নাগরী গ্রাম খরিদ করে সেখানে মিশনের কেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন। ভাওয়ালের লোকেরা আন্তোনিয়োকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

==== উত্তর আমেরিকার খবরাখবর ====

বারমুদায় সর্বপ্রথম বাঙালি ফাদারের আগমণ ও বাংলা খ্রীষ্টযাগ উৎস্বর্গ

রিপোর্ট - ভ্যালেন্তিনা অপর্ণা গমেজ

বিগত ১লা অক্টোবর সুদূর রোম থেকে নিউজার্সি হয়ে ফাদার শিমন প্যাট্রিক গমেজ বারমুদায় এসেছিলেন। তার আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল সকল বাঙালি ভাইবোনদের সাথে সাক্ষাৎ, পাপ স্বীকার প্রদান ও খ্রীষ্টযাগ উৎস্বর্গ। মাত্র ৪ দিনের সফরে তিনি বারমুদায় এসেছিলেন। ২রা অক্টোবর শনিবার সকাল ৯ ঘটিকায় 'সেন্ট তেরেজা চার্চে' তিনি সকল ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে পাপ স্বীকার শোনেন। ৩রা অক্টোবর রবিবার 'সেন্ট তেরেজা চার্চে বাংলা মিসা উৎস্বর্গ করেন। বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার মাঝেও সময় সুযোগ করে আমাদের ভাইবোনরা খ্রীষ্টযাগে উপস্থিত ছিলেন। আবার অনেকেই ইচ্ছা থাকা সত্বেও ডিউটি থাকার কারণে আসতে পারেননি তবে ফাদার তাদের সবার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছেন এবং অনেকের ঘরে গিয়েও তিনি দেখা সাক্ষাৎ করেছেন। খ্রীষ্টযাগ শেষে ১ ঘন্টাব্যাপী একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বাঙালি সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে। অনুষ্ঠানে শুরুতে চা-কফির ব্যবস্থা থাকায় সবাই একত্রে ফাদারের সাথে সহভাগিতা করেন। সবাই যথেষ্ট আনন্দের সাথে পারস্পরিক একাত্মতা প্রকাশের উন্মুক্ত সুযোগ পেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বক্তৃতা, ফুলের তোড়া প্রদান, সংগঠনের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান, দলীয় সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। সময়ের স্বল্পতার কারণে আমাদের অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়নি। সংগঠনের সদস্য সদস্যারা তাদের কর্মব্যস্তার ফাঁকে ফাঁকে ফাদারকে সময় দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অনেকেই ফাদারকে অনুরোধ করেছেন ঘর আশীর্বাদের জন্য আবার অনেকেই বিশেষ আশীর্বাদ নেয়ার উদ্দেশ্যে ফাদারের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে বিশেষ পরামর্শ কামনা করেছেন। ফাদারের আগমণে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। সেই সাথে পারস্পরিক যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক এবং আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল তাতে সত্যিই মনে হয়েছে একাত্মতার চেয়ে বড় কোন সুখ নেই। ঈশ্বরের কৃপাতে এবং সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সব কিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ৫ই অক্টোবর ফাদার দুপুর দেড়টার ফ্লাইটে বারমুদা ত্যাগ করেন। বিদায়ের মুহূর্তেও তিনি সবাইকে আশীর্বাদ দিয়ে গেছেন।

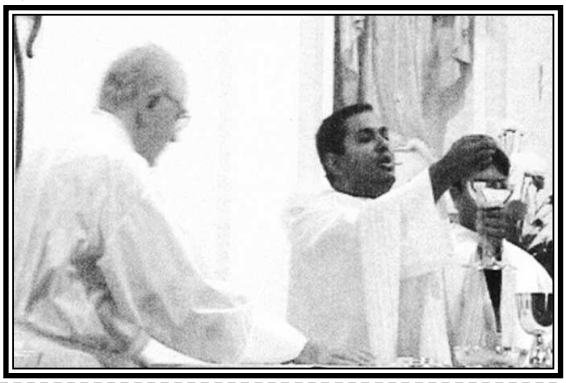

নর্থ ক্যারোলাইনার টুকি-টাকি সংবাদ

রিপোর্ট - সানি রোজারিও : দেখতে দেখতে আরো একটা বৎসর আমাদের জীবন থেকে চলে গেল। অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলিটা আরো কিছুটা পরিপূর্ণ করলাম। কিছু ভালবাসা, কিছু অভিমান, কিছু রাগ, কিছু পাওয়া, কিছু হারানো এবং কিছু দুঃখ-বেদনা এইতো আমাদের জীবনের প্রতিদিনের সঙ্গী এবং এনিয়েই এ বৎসরটা আমাদের নর্থ ক্যারোলাইনার বাঙ্গালি পরিবার এবং ভাইবোনদের বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কেটেছে।

পাস্কা পর্ব : প্রতি বৎসরের মত এবারও উন্মুক্ত পার্কে, বসন্তের মৃদু রৌদ্র আর হাল্ক ঠান্ডা বাতাসে এবারে পবিত্র পাস্কা পর্বের আনন্দ উপভোগ করা হয়।

সারাদিন এই অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিবাহিত এবং অবিবাহিত পুরুষদের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা। বাবাদের অনেকদিনের খেলার অভ্যাস না থাকায় এবং কৌশলের অভাবে বলের পরিবর্তে মাঠে লাথি মেরে, পায়ে ব্যাথা পেয়েও জয়ের আনন্দ উপভোগ করেছেন।

বাচ্চাদের এবং যুবক-যুবতিদের দৌড়, ঝাপ, বাস্কেটবল খেলা এবং মা-দের রিলে-দৌড় ছিল প্রতিটা পরিবারের জন্য বিশেষ উপভোগ্য।

সুস্বাদু খাবার এবং তার মাঝে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য দই আর খৈ-ই ছিল সবার জন্য বিশেষ আকর্ষণ।

বাৎসরিক ক্যাম্প :

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও নর্থ ক্যারোলাইনায় বেশ কতগুলো বাঙালি পরিবার স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। জুন মাসের ১৮-২০ জর্ডন লেকের গ্রুপ ক্যাম্পিংয়ের স্থান নির্ধারণ করা হয়।

১৮ই জুন শুক্রবার সকাল থেকেই পরিবারগুলো নির্ধারিত স্থানে গিয়ে নিজেদের তাবু লাগানোর আয়োজন শুরু করে দেয়া হয়।

লেকের পারে ঝাউ গাছ পরিবেষ্টিত স্থানটি ছিল অপূর্ব। দু'দিনের এই উন্মুক্ত জীবন ছিল আমাদের

সবার জীবনের একঘেয়েমি থেকে কিছুটা অবকাশ নেয়া। বিশেষ করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ছিল এক বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণীয়।

মাছ ধরা, লেকে সাঁতার কাটা, রাতে বনের মধ্যে কাঠ জ্বালিয়ে তার পার্শ্বে বসে গান, নাচ করা এবং বিশেষ করে ভুতের গল্প বলা ছিল আমাদের প্রতিদিনের ব্যস্ততার জীবন থেকে বেশ আলাদা এবং জীবনে কিছুটা বিচিত্র আনা এবং আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় আমাদের গ্রাম দেশের দাদী-নানীদের ভুতের গল্প বলার কথা।

বাংলা শিখা :

এই বৎসরটা ছিল আমাদের জন্য বেশ সৌভাগ্যের। ড. জো ডি'সিলভা এর সহযোগিতায় আমরা ফাঃ পিশাতোকে নর্থ ক্যারোলাইনায় পাই এবং তিনি আমাদের মাঝে বাংলা শিখা উৎস্বর্গ করেন। শিখার পর পরই ডুরেন্ট পার্কে মধ্যান্নভোজের আয়োজন করা হয়। বিশেষভাবে আমরা যারা নটর ডেম কলেজে ছাত্র ছিলাম, তাদের জন্য দিনটি ছিল সত্যিই আনন্দের। অনেক দিন পর তাদের পুরোন প্রিন্সিপালকে পেয়ে গল্প গুজবে বেশ মেতে উঠেছিলেন। দু'দিনের এই সফরে ফা পিশাতো অনেকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে প্রার্থনা সভা এবং বাড়ি আশীর্বাদে ব্যস্ত ছিলেন।

বিশপ মোজেস-এর আগমণঃ

এই প্রথমবারের মত আমরা নর্থ ক্যারোলাইনাতে বাঙালি বিশপকে পেয়ে নিজেদেরকে অনেক ভাগ্যবান মনে করেছি।

দু'দিনের সফরে তিনি নর্থ ক্যারোলাইনায় আসেন এবং তিনি আমাদের বাংলাদেশের ময়মনসিংহ এবং দিনাজপুর খ্রীষ্টানদের অবস্থা আমাদের মাঝে তুলে ধরেণ এবং সাহায্যের আবেদন জানান।

সেন্ট র‍্যাফেল চার্চে বাংলা শিখার মাধ্যমে আমাদের দিনটি শরু হয়। আরতি উৎস্বর্গ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে প্রথমে বিশপকে সম্বর্ধনা করা হয়। শিখার পর পরই সেন্ট র‍্যাফেল হলে মধ্যহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাচ, গানের মাধ্যমে ছোট একটা সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্তি কথা হয়।

উলে-খযোগ্য যে, এই অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনায় ছিল আমাদেরই ছেলেমেয়েরা। তাদের এই প্রচেষ্টা আর উদ্দীপনা, উৎসাহ ছিল আমাদের জন্য বড় সার্থকতা।

ফাদার শ্যামল :

বিশপের রেশ কাটতে না কাটতেই অপ্রত্যাশিতভাবে ফাদার শ্যামলের আগমণ। ফাদার শ্যামল ফিলিপাইনে পড়াশুনা করছেন। ছুটিতে বেরিয়েছেন প্রবাসী বাঙালিদের সাথে দেখা করার জন্য এবং তাদের মাঝে বাংলা শিখা উৎস্বর্গ করার জন্য। তার সুন্দর উপদেশ এবং অভিজ্ঞতার কথা বলে আমাদের বেশ উৎসাহিত এবং সৃষ্টিয় মনোভাবে আরো উৎসাহিত করেন।

মিঃ শ্যামল ও বীথি গমেজের পরিবারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এই সুন্দর বাংলা শিখা এবং পুরো ব্যবস্থাপনার জন্য।

হারানো :

আমাদের অনেক প্রিয় আর সবার ভালোবাসার মাসী 'ক্যাথরিনা ডলি গমেজ' বিগত জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে পরজীবনে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি ৬৫ বৎসর বয়সে দু'ছেলে, এক মেয়ে আর ৮ জন নাতী-নাতনী রেখে গেছেন। র‍্যাল্‌ফ মেমোরিয়েল পার্কে তাঁকে সমাধীস্থ করা হয় এবং এতে সব বাঙালি পরিবার উপস্থিত থেকে শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেন।

কবিতা

বড়দিন

– রকি গমেজ পাচু, রেলে, নর্থ ক্যারোলিনা

আয়রে তোরা আয়, দেখবি যদি আয়,
শিশু যীশু শুয়ে আছে ছোট গোশালায়।
মায়ের মুখে জয়ের হাসি, বাবার বুকে গর্ব,
মোদের তরে যীশু এলো কি দিব তারে অর্ঘ্য।
যত পাপ ভুলে মোরা যদি করি তার পুজা
তবে পাব স্বর্গের আলো দিবে তব ক্ষমা।
বড়দিন নামে তার বড় বিশ্বজনের তিনি,
গরীব বেশে জন্ম নিয়ে হলেন বিশ্বখ্যাত।
ছোট –বড় নেই ভেদাভেদ, তার নামে আজ সবে,
একে অন্যের –কাঁধে মিলে বুকের ব্যথা সব ভুলে।
প্রতি বছর যীশুর জন্মদিনে বিশ্ব ভুবন আনন্দে মাতে
ছুটে তারে দিতে অর্ঘ্য এক সাথে মিলে মিশে।

দাদু – দিদিমা

শিউলী গমেজ পাচু, রেলে, নর্থ ক্যারোলিনা

বলেছিলে কাছে ডেকে চলে যাব যেদিন,
বুঝবে তোমরা কত কাছে ছিলাম আমরা সেদিন।
বুঝি নাই দাদু সে সময় তোমাদের কথা,
এখন বুঝি দাদু–দিদিমা হারানোর ব্যাথা।
পৃথিবীতে আছে যার প্রিয়জন বেঁচে
চলে যাওয়ার ব্যাথা সে বুঝিবে বা কিসে।
তাই দাদু বুঝি নাই তোমাদের কথা,
এখন বুঝি মর্মে মর্মে কি সে ব্যাথা।
ভালোবেসে মোদের তোমরা রেখেছিলে বুকে করে,
বুঝতে দাওনি অভাব কখনো বুঝিনিতো আগে।
এখন বুঝি বলতে কেন সময় নাই আর বাকী,
খোঁজ খবর নিত্ত তোমরা দিত্ত নাতো ফাকী।
দাদু–দিদিমা তোমাদের কথা থাকবে মনে সবার,
ছিলে তোমরা সবার প্রিয়, ভুলবে না তোমাদের কেহ
শূন্য অন্তর ভরে দাও তোমরা স্বর্গের বারতায়।
এই আশীষ মাগি দাদু–দিদিমা তোমাদের কাছে
শুধু এই কামনা ।

৭ই ডিসেম্বর দিদিমার মৃত্যুবার্ষিকী (হেলেন রোজারিও)
৯ই ফেব্রুয়ারী দাদুর মৃত্যুবার্ষিকী (যোসেফ রোজারিও)
তাহাদের দুই জনের স্বরণে এই কবিতা

যে খ্রীষ্টভক্তেরা বড়দিন ঘৃনা করে

ওয়াল্টার বিশ্বাস, ক্যালিফোর্নিয়া

যখন যীশুর জন্ম হয়
তখনো হয়নি জন্ম ইতিহাসের।
ছিলনা তখন জন্ম–বিবাহ–মৃত্যু দফতর,
ছিলনা ইতিহাসবেত্তা, সংরক্ষনাগার।
ঘটনা বিবরন ছিল মুখে মুখে,
ঠোঁটে ঠোঁটে –
একটি অলিখিত ইতিহাস পঞ্জিকা।
সেকালের মৌখিক কৃষ্টির কারনে
যীশুর জন্ম তারিখটি হয়নি লিপিবদ্ধ কোন কাগজে,
কিম্বা ইটের পাজরে, পাথরে,
তাই মশীর কবরের মতন
যীশুর জন্ম দিনটির সন্ধান
আজো মিলিলোনা পৃথিবীর ইতিহাসে।
তারপর একদিন
কি জানি কেমন করে
এলো পঁচিশে ডিসেম্বর –
পৃথিবীর প্রিয় বড়দিন,
শুভদিন।

এই উৎসব মুখরিত পবিত্র দিনটি কলুষিত পৃথিবীর
আত্মপরীক্ষার দিন,
তাই সমগ্র জগতের অগনিত মানুষ –
ধনী দীন,
জ্ঞানী গুনী
ধার্মিক পাপি,
তিন পন্ডীত ও রাখালদের ন্যয়
যীশুর চরনে জানায় প্রনতি।

এই শুভ দিনটির আগমন – উৎসব–মংকৃত আকাশে
আবার যেন দেখি সেই নবতারাটিকে,
আবার শুনি যেন স্বর্গদুতের গান,
আবার যীশু জন্ম নেয় পংকিল – হৃদয় – বস্তিতে,
অনুভূতি ও বিশ্বাসে।
সারা বৎসরের শুষ্ক – ক্লান্ত প্রান – আত্মায়
আসে সজিবতা
জেগে উঠে মন নবোক্কুরিত তৃনের মতন,
পরিবারে সংসারে মানুষে মানুষে বহে শুভ মিলনের স্রোত,
প্রবাহিত হয় প্রেম প্রীতি বিনিময়ের ঢেউ
নানা রং এ , বর্নে, গন্ধে, সুরে, তালে তালে।
কিন্তু হায়, এই বড়দিনের উজ্জল তারা
শনিবার ও যিহোবা মন্ডলীর হৃদয়াকাশে দেয়না আভা,
তারা ঘৃনা করে বড়দিন মানে যারা।
তারা বড়দিনের মাহাত্ম্য না দেখে
দেখে ঐতিহাসিক সত্যতাকে।

অতি ধার্মিক ফরিশীরা
যীশুকে করেছিল ঘৃনা
দেখে তাঁর বিশ্রামদিনে রোগীদের সুস্থকরা।
ফরিশীরা দেখেছিল বিশ্রামবার,
দেখেনি যীশুর মাঝে হচ্ছিল ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ।
তেমিন যিহোবা ও শনিবার চার্চ,
দেখে অনৈতিহাসিক পঁচিশে ডিসেম্বর,
দেখেনা শিশু যীশু স্পর্শ করে
কোটি কোটি পাপীদের অন্তর।

সত্যিকারের মানুষ

– প্রেমা ম্যাগডেলিন কস্তা, বাংলা বাজার, ঢাকা

লিখতে পারি বলতে পারি এ কথাটি মুখে,
এই কথাটি বলে বলে দিন কাটে সুখে।
বলতে পারা যত সোজা করতে পারা কঠিন,
হবে কিবা আয়ত্ব যদি হেলায় কাটাও দিন।
আমরা মানুষ সবাই জানি,
কত আছে সত্য বানী
লেখে এসব মুক্তমনি,
হয়ে তারা পরিশ্রমী।
আমরা এসব সবাই মানি,
কাজের বেলায় ইতি টানি।
জীবনটাকে গড়তে হলে,
বাড়তে হবে বলে বলে।
চেয়ে দেখ কতজনা,
সয়েছে যে বিরঙ্গনা।
কেন তারা হয়েছে জান,
শৃঙ্খলা যদি না মানো।
পড়াশুনা তোমার কাছে,
ভাল মন্দ সবই আছে।
ইচ্ছে যদি কর তুমি,
ছেরে দেব ভূতল ভূমি।
চলবে তখন খেচর হয়ে,
শুভ্র বাতাস বুলিয়ে দিয়ে।
করবে তুমি উন্নত'
মাথা করবে অবনত।
ত্রাসের আজ করছে খেলা,
বন্ধ করবে সারা বেলা।
পাখির মত উড়বে তুমি,
নিজের দেশের চরন চুমী।

বৃদ্ধ

হালকা বাতাসে নড়ছে সবুজ গাছের পাতা,
শেষ বয়সে পৌছানো বৃদ্ধ হাতে নিয়ে ছাতা।
পারি দিতে চাচ্ছে সে তার অন্ত পথ,
ভাবছে জীবনে কতটুকু ছিল সে সৎ।
সেই যোয়ান কালের কথা মনে পড়ে তার,
সংসারে কত শত দুঃখ ও বিপদ করেছে সে পার।
কতশত আপনজনা তখন ছিল তার ঘরেতে,
ত্রুটি ছিল না কাউকে আদর আপ্যায়ন করতে।
সহধর্মিনীর কত ইচ্ছা কত সাধ ছিল সে সময়,
শত চেষ্টা শত কষ্ট যেন তার মতই হয়।
ছেলে মেয়েগুলো ছিলো বড় আদরে,
পড়ালেখা করত তারা শীতল পাটির মাদুরে।
একদিন শেষ হল সহধর্মিনীর চাওয়া,
মেয়ে যত ছিল তাদেরও হয়েছে পূর্নতা পাওয়া।
ছেলের বউগুলো ব্যস্ত তাদের সংসার নিয়ে,
এখন তাদের প্রয়োজন নেই এই বৃদ্ধকে দিয়ে।
এখন সে শুধুই বোঝা হয়ে রয়েছে,
অসহায়ের দুঃখ এখনও সে সয়েছে।
তখন স্বপ্নের মাঝে ইচ্ছে করত বাচঁতে,
এখন কেন বাচঁলাম মানুষকে বিরক্ত করতে।
তখন সে শিক্ষা নিয়ে জানিয়ে দেয়,
বৃদ্ধ যারা হয় তার এমনি দুঃখ ময়।
আমার পুত্র যারা রয়েছে এখন সুখে,
মনে রেখ তোমরাও পা দিবে এই অসহায় বৃদ্ধে।

"মা"

অপূর্ব জেরাল্ড গমেজ, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া।

মাকে ক্ষীণ মনে পড়ে –
নিশ্চুপ একা অবসরে।
যখন দুঃখে থাকি –
তখন তোমাকেই 'মা' মনে আঁকি।
তোমার হাসি মাখা মুখ –
দূর করে আমার সমস্ত দুখ।
মনে হয় যেন তুমি কথা বলছো –
স্নেহের আদরে আমাকে ভাসাচ্ছো।

মা, তোমার মত আপন কেউ নেই,
সবাই নিজের কথা ভাবে, ব্যস্ত নিজেতেই।
মা, তোমার মত আমাকে কেউ ভালবাসে না,
সবার ভালোবাসায় আছে – শুধু হিসাবের আনাগোনা।

মা আমি তোমার কাছেই থাকবো সারাজীবন
চাই না টাকা কড়ি, চাই না নগরভূবন।
তোমার আদর্শেই জীবন গড়বো –
এই সবুজ গ্রামকে ভালবেসেই মরবো।

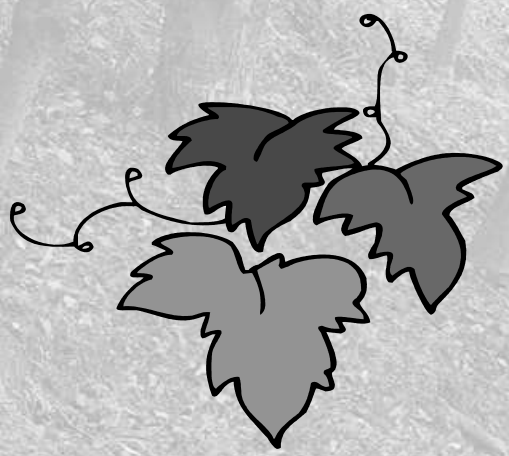

Thoughts

- Joy T. Rozario

Most virile of being - man,
Gentlest creature - woman.
There love and affection will find a way to mingle,
No matter how parents may prohibit and protect.
First he solicits the matchmaker,
Skilled in all the art a glib tongue can command,
Then plies her with cultural poems,
Bit by bit tangling the strings of her heart.
He seeks a glimpse of her face, so hard to see,
Listens for a voice as yet unheard.
As his yearning grows more fervid, he smiles in secret,
As his talks grow more intimate, he feels his heart break.
"Like the jeweled tree in my garden,
Like the faithful pine," he gestures, "I vow to flourish!
Like the felicitous herbs in my room,
Like the golden orchid," he points, "I promise to be pure!"
And now bodies grow subtly mild,
There wills little by little aroused,
She dwelling in loveliness,
In charms a match for ---
He speaks with a quiet elegance, that would shame--
Their longings begin to race forth wildly,
True passion now is born.
He form resplendent, replete with beauty,
Her posture tall and stately, with power to topple cities,
She dyes her crimson sleeve in a hundred scents
Till he has fallen slave to their fragrance,
Wraps her white fingers tight about his hand
And already he is lost in mazes of emotion.
A woman values her charity,
The completion that comes with the marriage rite,
But they have vowed to be true for a thousand years,
She finds joy in the first night's union.

Only You

~ Maureen Paul

If you are the sun, I see the sunrise.
If your love is the color of twilight sky, I see the sunset.
You are the moon in the midnight of a black blanket
which shines when you smile,
Hides when you cry.
The light is a hope that gives me a reason to live.
If you are the waves of the sea, I always see your eyes.
Your deceitful eyes pull me towards you.
If you are the sounds of raindrops, I always hear yours heartbeats,
Which let me live every second.
If you are the breeze, I always feel your touch;
Your fingers that glide over my hair and neck.
Thousands of unforgettable moments I have spent with you,
But you are unaware.
Why are you so far away?
I want to make you a part of me, but you are leaving me.
Memories, that I want to keep, but never really had.
Love, that I want to take, but you haven't given me.
You, that I want to make mine, but can't have.
What do I have?
I don't know.
But I do know, the person I pray for,
The person I always miss,
The person I have been waiting for is Only you.
Though I have found you,
Still you are lost.
But I have always known my love;
Only you.

The Christmas Star

It's up in the sky!

Way up high

It's white and bright

It comes out in the night.

On your bed, when you're lying.

Just quietly say good bye!

By
Stella Priya Gomes
Jersey City, NJ

An Elephant

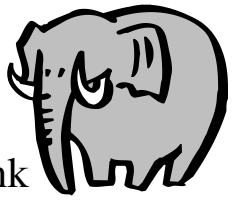

An Elephant has . . .
Eyes like a rabbits
Legs like a gaint tree trunk
Ears like a gaint hard fan
A trunk like a long tree branch
A memory like ME!

An Elephant is . . .
As wrinkled as my grandma
As stately as prince charming
As slow as a sloth
As heavy as a sumo wrestling
As strong as a Gorilla

By
Coriline Sreeah Rozario
Garner, North Carolina

জেনে রাখা ভাল

- সংগ্রহে ঃ তিলু বার্ণাডেট গমেজ

১. মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার সুনাম।
২. ধৈর্য্য ও শিষ্টতা হচ্ছে শক্তি।
৩. সম্পদ অস্থায়ী কিন্তু সুনাম দীর্ঘস্থায়ী।
৪. কষ্ট ও ক্ষতির পর মানুষ বিনয়ী ও জ্ঞানী হয়।
৫. রূপ চোক জুড়ায়, গুণ হৃদয় জয় করে থাকে।
৬. স্বাস্থ্যের চেয়ে বড় সম্পদ এবং অল্পে সন্তুষ্ট থাকার চেয়ে বড় সুখ আর কিছু নেই।
৭. স্বাস্থ্য রক্ষার প্রথম কথাই হচ্ছে সুখী থাকা।
৮. সকল প্রকার যন্ত্রণার মহা ঔষধ হচ্ছে আনন্দ ও ঘুম।
৯. মানুষের মনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো সংশয়, অবিশ্বাস আর সন্দেহ।
১০. ঋণ করার অভ্যাসই হচ্ছে নিকৃষ্টতম দরিদ্রের লক্ষণ।
১১. শিক্ষা যে দান করে সে আলোর মানুষ, তা তার জীবন আলোকময় করে।
১২. ভাল কাজ করা হলো, মানুষের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

শুভ পরিণয়

পল ও ক্যারেন গমেজ
লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক

আরমন্ড ও দোলা গমেজ
জুন ২৬, ২০০৪ টরেন্টো, কানাডা

রাফায়েল ও ক্যাথরিন গমেজ
লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক

যাদেরকে পেলাম

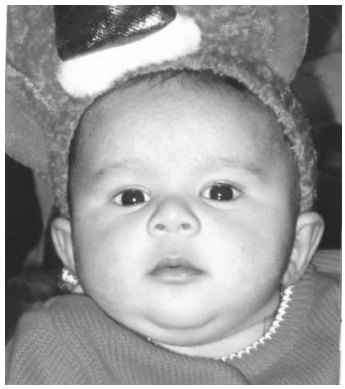

এরিক সাইমন এ্যান্থনী গনছালভেস
জন্ম ঃ ৬ অক্টোবর, ২০০৪
পিতা ঃ গে-ন গনছালভেস
মাতা ঃ ইলোরা গনছালভেস
ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক

এ্যান্থনী রড্রিগাস
জন্ম ঃ ১৮ নভেম্বর, ২০০৪
পিতা ঃ লুইস রড্রিগাস
মাতা ঃ সিলভানা রড্রিগাস
কুইন্স ভিলেজ, নিউইয়র্ক

AN APPEAL TO SAVE A LIFE

December 14, 2004

Dear Brothers and sisters,

I am Teresa Sima Rozario. I was one of the teachers in S.F.X. Greenherald International School, Dhaka, Bangladesh. My husband, Alphonsus and I are blessed with a daughter, Christine.

I was diagnosed with blood cancer in Dhaka on Christmas Eve 2003. As there was no treatment in Bangladesh, Alphonsus and I went to Calcutta, India on the 1st week of January 2004. I got admitted in one of the cancer hospitals in Calcutta, but for better treatment, we flew to Vellore, Tamil Nadu at the end of January. After various tests, I was admitted in Christian Medical College Hospital, during the 2nd week of February. All my brothers and sister gave blood to see if there was a match for HLA (Tissue type) for the blood stem cells transplant but did not match with my type. Although I had undergone chemotherapy treatment, blood stem cells transplant could not be done because the test result was not a match. We could not find any other donor transplant there, so we came back home, disheartened in the first week of June 2004.

Now we are settled in New York, USA. Recently I underwent chemotherapy along with another drug, both of which were just research study. Unfortunately 100% HLA match (donor) was found. Some of my cousins have already given blood for HLA test and some will be giving soon. Many of our relatives and friends have shown their eagerness for the test.

Patients from our Indian sub-continent have very little chance to get a match, as there are very few donors from our sub-continent enlisted as donors.

So my earnest request to you all is to enlist yourselves as a donor, which shall save a life, if not mine. At least some one from our community will benefit from this, if a match turns out.

Thanking you all,

Yours sincerely

Teresa S. Rozario

PS: For further information regarding donors, please visit **www.marrow.org**

How to be a donor

Go to a blood bank and tell them that you want your HLA tissue type tested. They will draw some blood an insert your result in the bone marrow registry. If any patients result matches yours, you will be called to donate stem cells, which will either be taken from the blood or from the marrow? These cells will be given to the patient by inter veins means. Eventually these cells will settle down in the marrow and start reproducing.